জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যম ও মাতৃভাষা

ড. সফিউদ্দিন আহমদ

জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যম ও মাতৃভাষা

ড. সফিউদ্দিন আহমদ

তিশা বুকস ট্রেড
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশকাল ❑ প্রথম তিশা সংস্করণ বইমেলা ২০০৩

প্রকাশক ❑ আফজাল হোসেন তিশা বুকস ট্রেড ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা) ঢাকা
অক্ষরবিন্যাস ❑ কমপিউটার ল্যান্ড ৩৮/২খ বাংলাবাজার (দোতলা) ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ ❑ সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ❑ মলয় স্বত্ব ❑ লেখক

মূল্য ❑ ১০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-8324-32-1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার শিক্ষক

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু—

www.pathagar.com

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

বইটি প্রথম প্রকাশ করে বাংলা একাডেমি। প্রকাশের পরপরই প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন দিক থেকে তাগিদের ফলেও নানা ব্যস্ততায় পরবর্তী মুদ্রণে আমি সায় দিতে পারিনি। দীর্ঘ এক দশক পর 'তিশা বুকস ট্রেড' বইটির এই নতুন সংস্করণ বের করছে। এবারের সংস্করণে আরো অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বাংলার দাবি অনেক আগে থেকেই। গভর্ণর স্যার জনশোর তাঁর 'Notes on Indian affairs' এ বলেছেন—

১. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত একটি জাতিকে অন্ততপক্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিতে হবে।
২. মাতৃভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শন শিক্ষার সুব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলরাও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার দাবি তুলেছিলো। তাদের 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নামক সংগঠনের ঘোষণাপত্রে ছিলো—

১. মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা সাহিত্যচর্চা করা।
২. সংগঠনের সমস্ত কাজকর্ম মাতৃভাষা বাংলায় পরিচালনা করা।

প্রাচ্য-প্রেমিক পণ্ডিত উইলসন সাহেব মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন—

'জাতীয় শিক্ষা ও সাহিত্য কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা যদি কেবল বিদেশী ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তা' সমাজের একদল মুষ্টিমেয় লোক যাদের অর্থ ও অবসর দু'ই আছে তাদের বিলাসের বিষয় হয়ে উঠে ইংরেজি কখনো এদেশের মানুষের শিক্ষার বাহন হতে পারে না। ইংরেজির মাধ্যমে শ্রেণীগত শিক্ষার ভিত গড়ে উঠতে পারে আর মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার বিকাশ ঘটে।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিভাগ ও বড়লাটের কাছে প্রেরিত দু'দুটি শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার উপর সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজনারায়ণ বসু ১৮৪৮ ও ১৮৫৬ খ্রীঃ মেদিনীপুরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বাংলার উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে দু'টো বক্তৃতা প্রদান করেন তা' বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বিভিন্ন বক্তব্য ও ভাষণে তাঁর অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থে আমি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেও তুলে ধরছি।

এই নতুন সংস্করণে আমাকে নানা বিষয়ে পরামর্শ ও মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। তাঁর প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

এক কালের ইংরেজি সাহিত্যের নন্দিত অধ্যাপক ও প্রাক্তন সচিব জনাব মোহাম্মদ আলী, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও চিৎপ্রকর্ষবিদ জনাব শাহাদাৎ হোসেন মন্টু, শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট শিল্পপতি মোফাজ্জল হোসেন খোকন বইটির নতুন সংস্করণে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করে আমাকে ধন্য করেছেন তাঁদের প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা।

প্রভাষক কিরণচন্দ্র বৈরাগী অনুজপ্রতিম আবুল কালাম আজাদ ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র রতন ও রিপনের আগ্রহ বইয়ের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। তাদের প্রতি আমার অসীম স্নেহ ও আশীর্বাদ।

অকাজের কাজে আমি বেশি ব্যস্ত থাকি বলে আমার পক্ষে বইটির প্রেস কপি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। আমার স্ত্রী শিরিয়া আহমদ, কন্যা স্বাতি-সেঁজুতি ও পুত্র সাকী আহমদ এই প্রেস কপি তৈরি করার ফলে নতুন সংস্করণ বের হওয়া সম্ভব হলো। তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের ত্যাগ, অবদান ও প্রেরণাই আমার লেখার উৎস।

'তিশা বুকস ট্রেড' এর স্বত্তাধিকারী ও নন্দিত প্রকাশক সুপ্রিয় অনুজপ্রতিম তোফাজ্জল হোসেন বইটি প্রকাশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মূল শিকড়
'ছায়াবীথি'
রায়পুরা
নরসিংদী

ড. সফিউদ্দিন আহমদ
গাজীভবন ৬-সি
৪১, নয়াপল্টন
ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি থেকে প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

নিবেদন

ঔপনিবেশিক মানসিকতার ফলেই আমাদের এমন একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে, যা কিছু ভালো এর সবই আমরা পাশ্চাত্যের কাছে পেয়েছি। এখানে অবশ্যিই আমাদের শিকড় বিচ্যুতি এবং ঐতিহ্য বিস্মৃতিকেও মনে রাখতে হবে। আমরা মোটেই শিকড়ের সন্ধানে ও পরিচয়ের সন্ধানে আগ্রহী নই।

১৯৭১ সনের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ে আমরা আমাদের জাতিসত্তা ও আত্মপরিচয় নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে গর্বের সাথে দাঁড়িয়েছি কিন্তু আমাদের প্রকৃত পরিচয় ১৯৭১ সন হতেই নয়—আমাদের প্রকৃত পরিচয় পাহাড়পুর, ময়নামতি ও মহাস্থানগড়ে, বরেন্দ্র ও সমতটে, মঠ-বিহার ও মন্দিরে-মসজিদে এবং পদ্মা-মেঘনা যমুনা ও সুরমা-কুশিয়ারার জীবন স্পন্দনে।

আমরা কোন দেউলিয়ে জাতি নই—আমাদের একটি মহিমান্বিত অতীত ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে, আমাদের প্রাণের স্তরে স্তরে হৃদয়ের গভীরে, আত্মার স্পন্দনে রয়েছে মহান ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমাদের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি মৃত্তিকাশ্রয়ী এবং অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনায় ভাস্বর।

বিজাতি বিভাষীরা হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের শাসন ও শোষণ করেছে, তারা আমাদের মহিমান্বিত অতীত ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে আবৃত করে অনেক ভুল তথ্য আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। নবীন গবেষকদের উপর আজ এ মহান দায়িত্ব পড়েছে যে, তারা আমাদের ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌলসত্তাকে বিশ্বের চোখে নতুন করে তুলে ধরবেন।

ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার মশালে আমরা আলোকিত হয়েছি ঠিকই—কিন্তু শিকড় বিচ্যুতও হয়েছি। আর ইংরেজ আমাদের অনেক ক্ষতির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি করেছে বাংলাদেশকে শিকল টেনে খণ্ডিত করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবীজ ছড়িয়ে দিয়ে। এই বিভাজন ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ আজ উগ্রচণ্ডীরূপ ধারণ করেছে।

আজ আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার কাছে নতজানু কিন্তু আমরা দেদার ভুলে গেছি যে, আমাদের শিক্ষা ও দর্শনের কাছে একদিন পাশ্চাত্যই নতজানু ছিলো। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য এবং সভ্যতা তো মাত্র সেদিনের। গাঁথা কাব্য বেউলফ আর চসার থেকে মাত্র তাদের উৎসারণ। অথচ আমাদের ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

www.pathagar.com

এবং দর্শন ও সভ্যতা তাদের হাজার বছরেরও আগের। তক্ষশীলা আর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়েও পাহাড়পুর, ময়নামতি আর মহাস্থানগড়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো তা আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিদরাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। পৃথিবীর কোথাও যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটিও নেই তখন আমাদের দেশেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সমগ্র পৃথিবীতে আমাদের অতীশ দীপঙ্কর আর শীলভদ্রই প্রথম পরিদর্শক শিক্ষাগুরুরূপে বিশ্বের ঘরে ঘরে প্রমিথিউসের মতো জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে পরিভ্রমণ করেছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের শিক্ষার একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। আর আমাদের শিক্ষা ছিলো জীবনের অনুষঙ্গ।

লাখো শহীদের আত্মত্যাগে, একসাগর বুকের রক্তে ও মা-বোনের ইজ্জতের বদলায় আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার প্রায় পঁচিশ বছর হলো অথচ আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্যন্ত আমরা একটি যথার্থ ও বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারিনি। দেশের শিকড় বিচ্যুত মেকলের সেই দারোগা কেরানি আমলা সৃষ্টির শিক্ষানীতির জোয়াল এখনো আমাদের কাঁধে চেপে আছে—যে শিক্ষায় দেশ মাটি ও মানুষ এবং মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নেই।

প্রতিবছর আমরা উচ্চশিক্ষার নামে শিকড়বিহীন এবং টবের ফুলগাছের মতো কতোগুলি শিক্ষার্থীকে মূল্যহীন সনদপএ দিয়ে The charge of light brigade কবিতার সৈন্যদের মতো এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিচ্ছি মাত্র, যাদের কোনো লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই।

বর্ণপরিচয়ের সাথে সাথেই একটি শিশুকে মাতৃভাষাসহ তিনটি ভাষা শিক্ষার গোলক ধাঁধায় পড়তে হয়—আর জোর দেয়া হয় বিদেশী ভাষা তথা ইংরেজি ও আরবির উপর। ভাষা শিক্ষার এমন চরম অত্যাচার ও মানসিক নির্যাতন আর কোনো দেশের শিশুদের সহ্য করতে হয় না।

আমাদের অনেকেরই ধারণা যে, মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম ১৯৫২ সন হতে। আসলে এ সংগ্রাম প্রাচীন ও মধ্যযুগ হতে এবং আধুনিক যুগে ইয়ং বেঙ্গলদের দ্বারা মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার দাবি তীব্রতর হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে।

রাশিয়া, চীন ও জাপান মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় এবং বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে অথচ বঙ্গজ পণ্ডিতদের কাছে মাতৃভাষা বাংলা আজও অফিস আদালতে কাজ চালানো, বিজ্ঞান সাধনা ও উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে নাকি উপযুক্ত নয়! এই তো মাত্র ক'দিন আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সচিব দম্ভভরে নাক সিটকিয়ে বলেছেন যে, তার মাতৃভাষা বাংলা নয় উর্দু। (সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, ১৩ বর্ষ ২৫ সংখ্যা)। মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম বেঁচে থাকলে জানিনে আজ এই বঙ্গসন্তান সম্পর্কে কি উক্তি করতেন!

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যম ও মাতৃভাষা নিয়ে আমি দু'টো প্রবন্ধ লিখি বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৯২, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৯)। এ প্রসঙ্গে আমি * হজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুমিল্লা বোর্ডের সেমিনারে দু'টি বক্তৃতা প্রদান করি। উল্লিখিত দু'টি প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার আকর হতেই এ গ্রন্থ।

এই গবেষণা গ্রন্থে আমি বিশ্লেষণের চেয়ে তথ্যের উপরই বেশি জোর দিয়েছি। এ সমস্ত তথ্য গবেষকদের গবেষণাকর্মের সহায়ক হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গ্রন্থ রচনায় আমাকে উদারভাবে উৎসাহ, পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছেন আমার শিক্ষক ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর কবীর চৌধুরী, ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রফেসর হাসান ওয়ায়েজ, ড. এফ. কে. চৌধুরী, অধ্যক্ষ আবদুল মতিন ও গবেষক-সাহিত্যিক জনাব শামসুজ্জামান খানকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাংলা একাডেমীর গবেষণা উপবিভাগের গবেষক-সাহিত্যিক ড. সুকুমার বিশ্বাসের আন্তরিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফলেই এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাছে এবং বাংলা একাডেমি প্রেসের উৎপাদন অফিসার জনাব আফজল হোসেন, গবেষণা সহকারী আবদুল লতিফ তালুকদারের কাছে আমার অনন্ত ঋণ।

তরুণ কবি খোকন সরোয়ার সুদূর লন্ডন হতে এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য শুধু আগ্রহই প্রকাশ করেনি, অনেক তথ্য পাঠিয়েও সাহায্য করেছে। তাকে অনন্ত শুভেচ্ছা।

এই গ্রন্থ রচনায় আমার স্ত্রী শিরিয়া আহমদ এবং আমার কন্যা স্বাতি, সেঁজুতি ও পুত্র সাকীর স্বতঃউৎসারিত প্রেরণা আমাকে উৎসাহিত করেছে।

পরিশেষে বইটি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক প্রফেসর মোহম্মদ হারুন-উর-রশিদ-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। চূড়ান্তভাবে বইটির নামও তিনি নির্বাচন করে দেন। এ জন্যও আমি কৃতজ্ঞ।

নববর্ষ
১৪০১

সফিউদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিষয়সূচি

১. শিক্ষানীতির রূপরেখা : প্রথম পর্ব / ১৩
২. শিক্ষানীতির রূপরেখা : দ্বিতীয় পর্ব (রবীন্দ্রনাথ) / ৬৬
৩. শিক্ষানীতির রূপরেখা : তৃতীয় পর্ব / ১২৪
৪. পরিশিষ্ট / ১৫১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষানীতির রূপরেখা : প্রথম পর্ব

এক

'শিক্ষার মাধ্যম ও মাতৃভাষা' প্রসঙ্গে আলোচনার প্রথমেই পবিত্র গ্রন্থ 'কোরান' ও 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের বাণী দিয়ে শুরু করা যাক—

১. "ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক।
খালাকাল্ ইন্‌সানা মিন্ আলাক।
ইক্‌রা ওয়া রাব্বুকাল আক্‌রাম।
আল্লাযী আল্লামা বিল্ কালাম।
আল্লামাল্ ইন্‌সানা মা লাম ইয়ালাম।"[১]

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে একবিন্দু রক্তপিন্ড থেকে। পাঠ কর, জ্ঞান অর্জন কর, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা সে জানত না তা তিনি তাকে শিখিয়েছেন।"

২. 'অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গমরেতি।'[২]
অসৎ হতে আমাকে সৎ পথে নিয়ে যাও।
অন্ধকার হতে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও
এবং
মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও।

উপরের এই উজ্জ্বল ও অবিনাশী এবং চিরন্তন উচ্চারণের মধ্যেই জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ইঙ্গিত রয়েছে সবগুলো ধর্মগ্রন্থেই। অন্যদিকে 'বাইবেল' শব্দটির অর্থই হলো 'বই' আর ব্যাপক অর্থে জ্ঞান বা শিক্ষা।

আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থ নেই।.....জীবন লক্ষ্যহীন হলে শিক্ষাও লক্ষ্যহীন হওয়া স্বাভাবিক।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে আমাদের শিক্ষার চরম অন্তঃসারশূন্যতার চিত্রই ফুটে ওঠে। আসলে মানুষকে মানুষ করে তোলাই এবং মনুষ্যত্বের বিকাশই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

মূলত যে শিক্ষায় সমাজের গুণগত পরিবর্তন নেই, প্রগতিরও ইঙ্গিত নেই, আর যে শিক্ষায় টবের ফুলগাছ বা পরগাছার মতো শিকড় বিচ্যুত কতগুলো মানুষ জিয়ে ওঠে, যাদের সাথে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার এবং দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কোন সম্পর্ক নেই, এ শিক্ষায় কখনো প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠতে পারে না। বর্তমানে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে কেন এমন নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস, ছাত্রদের হাতে কেন বই ও কলমের পরিবর্তে অস্ত্র, পরীক্ষায় রেকর্ড পরিমাণ মার্ক পেয়েও ছাত্র-ছাত্রীরা কেন বোঝে না সে কি পড়ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কেন এতো মানসিক, আত্মিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়—এসবের মূল কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের স্তাবক ও চতুর পণ্ডিত মেকলে সাহেব যতোই দম্ভোক্তি করুক না কেন A Single Shelf of good European Library was worth the whole native Literature of India and Arabia[৪] কিন্তু তিনি জানেন না, যে চিরন্তন ও অবিনাশী বাণী দিয়ে এ গ্রন্থের শুরু—সমগ্র পাশ্চাত্য বিদ্যা একত্র করলেও এর সমান হবে না।

একদিন আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিলো জীবনমুখী, মানবিক চেতনায় উজ্জ্বল, আত্মিক ঐশ্বর্যে ভাস্বর ও মৃত্তিকাশ্রয়ী। আর সেদিন আমাদের শিক্ষার শিকড় দেশের মাটির গভীরে প্রোথিত ও সম্পৃক্ত ছিলো বলেই, প্রত্যয় ও দৃঢ়তা ছিলো এবং আত্মস্থ করার ক্ষমতাও ছিলো প্রবল। বাংলাদেশের প্রাণের ভেতরে, হৃদয়ের গভীরে এই দৃঢ়তা ও প্রত্যয় এবং আত্মস্থ করার ক্ষমতার জোরেই বিজাতি ও বিভাষীর প্রবল গ্রাসেও আমাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য একটুও ম্লান হয়নি বরং ফিনিক্স আর ইকারোসের মতো বার বারই সংকট ও প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে নব কলেবরে এর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করেছে এবং এর অস্তিত্বের উজ্জ্বল বিকাশ ঘটেছে।

মেকলে সাহেবের দম্ভোক্তি নিয়ে যারা গর্ব করে তারা জানে না যে, মেকলেরা এসেছিলেন যাদুকরের মেকি প্রদীপ নিয়ে আর নিবিয়ে দিয়ে গিয়েছেন আমাদের আসল প্রদীপটি। এজন্যই আমাদের ঐতিহ্য আত্মানুসন্ধান করতে হবে, সচেতন হতে হবে স্বরূপের সন্ধানে, উৎসের সন্ধানে ও শিকড়ের সন্ধানে।[৫]

একমাত্র গ্রীক ছাড়া পাশ্চাত্যের অন্য কোনো জাতির যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনাই হয়নি তখন আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্ঞানালোক ধারায় বিশ্বকে করেছে অভিস্নাত, এবং অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতেরা নন্দিত হয়েছেন সমগ্র বিশ্বে।

পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তি আমাদের দেশ দখল করেছে আত্মার শক্তির জোরে নয়, দানবীয় দৈহিক শক্তির বলে, আর তারা প্রথমে আমাদের ধাঁধিয়ে দিয়েছে জ্ঞানের মশাল দিয়েও নয়, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি আর নারকীয় যুদ্ধের বিভীষিকায়।

আমাদের দেশের মাটি থেকে জনজীবনের গভীর সম্পৃক্ততা নিয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্ গড়ে উঠেছিলো তা সৌরলোকের উজ্জ্বল আলোক না হয়ে মাটির প্রদীপ হলেও এর সাথে আমাদের মন-প্রাণ ও আত্মার সম্পর্ক ছিলো। ছিলো এখানে জীবনকে জানার ও চেনার দিকচিহ্ন। অর্থাৎ শিক্ষা ছিলো জীবনের অনুষঙ্গ।

আজ আমরা যখন আশ্রম, স্নাতক ও স্নাতকোত্তীর্ণ এবং 'সমাবর্তন উৎসব' প্রভৃতি শব্দগুলোর উচ্চারণ শুনি— তখন এসব শব্দের ঐতিহ্যিক আবহ ও উৎসের সন্ধান করলেই আমরা বুঝতে পারবো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা কতো গভীরভাবে জীবনের অনুষঙ্গ ছিলো।

আমাদের ছাত্ররা সেদিন আশ্রমে ঘর ঝাড়ু দিয়ে, গো-পালন করে, হাল চাষ করে, ফসল ফলিয়ে, মাটির মমতারসে সিক্ত হয়ে, জীবনের সাথে অনুষঙ্গ লেখাপড়া শিখেছে। আজকের মতো শুধু দু'চারটি বুলি মুখস্থ করে বা একগাদা সার্টিফিকেট নিয়ে নয়—বাস্তব অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান লিপি বুকে চেপে, জীবন সমুদ্র সাঁতরাবার মতো শক্তি নিয়েই শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহ থেকে বিদায় নিতো।[৬(খ)] আর গুরুও সেদিন শিষ্যের কপালে রক্তচন্দনের টিপ পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে বলতেন "যাও আজ থেকে কোনো প্রতিকূলতাই তোমাকে প্রতিহত করতে পারবে না।" এজন্যই বলা যায় আরুণির কাহিনীতেও একটি বাস্তব সত্য লুক্কায়িত আছে।

বিদ্যা সেদিন বাজারের পণ্য ছিলো না এবং বিদ্যা বিক্রিও হতো না। বিত্তের সাথে বিদ্যারও একটা সামঞ্জস্য ছিলো। বিদ্যা যে ধন উপার্জনের হাতিয়ার তা আমরা প্রথম পাশ্চাত্যের কাছেই শিখলাম। এজন্যই দেখা যায় যে, একই বিদ্যা দিয়ে একদল গাড়ি, বাড়ি ও সম্পদের পাহাড় গড়ে আর শিক্ষকেরা আত্মার ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ হবার ফলেই বলেন—'আত্মানং বিদ্ধি, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।'

www.pathagar.com

অবশ্যি মুসলিম রাজত্বের শেষে এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিক থেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমার বক্তব্যের বিপরীত চিত্রও পাই। শিক্ষা ব্যবস্থার এক অসঙ্গতি ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপর পাশবিক নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী—

> সে সময়কার পাঠশালের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর বর্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন। তাঁহারা আসিয়া কোনও ভদ্র গৃহস্থের গৃহে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্র হস্তে মধ্যস্থলে একটি খুঁটি ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। সর্দ্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বালকেরা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিত। বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত। লিখিত এইজন্য বলিতেছি, তৎকালে পাঠ্যগ্রন্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না। কিছুদিন পাঠশালে লিখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানগণ টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিত, এবং যাঁহারা সন্তানদিগকে রাজকার্য্যের জন্য শিক্ষিত করিতে চাহিতেন, তাঁহারা তাহাদিগকে পারসী পড়িতে দিতেন। যাহারা জমিদারী সরকারে কর্ম্ম করিতে বা বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে চাহিত, তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালে থাকিত।
>
> পাঠশালে পাঠনার রীতি এই ছিল যে, বালকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়া বর্ণ পরিচয় করিত, তৎপর তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শটিকা, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া প্রভৃতি লিখিত; তৎপর তালপত্র হইতে কদলীপত্রে উন্নীত হইত; তখন তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী প্রভৃতি শিখিত; সর্ব্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠিপত্র লিখিতে শিখিত। সে সময়ে শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষের মধ্যে এইটুকু স্মরণ আছে যে, পাঠশালে শিক্ষিত বালকগণ মানসাঙ্ক বিষয়ে আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখাইত; মুখে মুখে কঠিন কঠিন অঙ্ক কষিয়া দিতে পারিত। চক্ষের নিমিষে বড় বড় হিসাব পরিষ্কার করিয়া ফেলিত। এক্ষণে যেমন ভৃত্যের দশ দিনের বেতন দিতে হইলেও ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কাগজ ও পেন্সিল চাই, ত্রৈরাশিকের অঙ্কপাত করিয়া কাগজ ভরিয়া ফেলিতে হয়, তখন সেরূপ ছিল না।
>
> গুরুমহাশয়গণ বর্ত্তমান স্কুল সমূহের শিক্ষকগণের ন্যায় কোনও কমিটী বা কোনও ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক গৃহস্থ আপন আপন বালককে বা বালকদিগকে পাঠশালে দিবার সময় গুরুমহাশয়ের সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতেন। এইরূপে মাসে সামান্য ১০/১২ টাকা আয় হইত। তৎপরে যাত্রা, মহোৎসব, পার্ব্বণ বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে উপরি কিছু কিছু জুটিত। তাহাতেই গুরুমহাশয়দিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। শুনিতে পাওয়া যায়, যে ছেলে লুকাইয়া গুরুমহাশয়কে যত দিতে পারিত, সে তত তাঁহার প্রিয় হইত। সে অনুপস্থিত থাকিলে বা পাঠে অমনযোগী হইলেও সমুচিত সাজা পাইত না। যে সকল বালক কিছু দিতে পারিত না, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। উঠিতে বসিতে, নড়িতে চড়িতে, গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পৃষ্ঠে পড়িত। হাত ছড়ি, লাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি সাজার বিবিধ প্রকার ও প্রণালী ছিল। পাঠশালে আসিতে বিলম্ব হইলে হাত ছড়ি খাইতে হইত; অর্থাৎ আসনে বসিবার পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের সমক্ষে দক্ষিণ হস্তের পাতা পাতিয়া দাঁড়াইতে হইত, অমনি সপাসপ্, পাঁচ বা দশ ঘা বেত তদুপরি পড়িত। এই গেল হাত ছড়ি। লাড়ুগোপাল আর এক প্রকার। অপরাধী বালককে গোপালের ন্যায়, অর্থাৎ চতুষ্পদশালী শিশুর ন্যায় দুই পদ ও এক হস্তের উপরে রাখিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি এগার ইঞ্চ ইট বা অপর কোন ভারি দ্রব্য চাপাইয়া দেওয়া হইত; হাত ভারিয়া গেলে, বা কোনও প্রকারে ভারি দ্রব্যটি স্বস্থানভ্রষ্ট হইলে তাহার পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক গুরুতর বেত্র প্রহার করা হইত। ত্রিভঙ্গ আর এক প্রকার।

www.pathagar.com

শ্যামের বঙ্কিম মূর্ত্তির ন্যায় বালককে এক পায়ে দণ্ডায়মান করিয়া হস্তে একটি গুরু দ্রব্য দেওয়া হইত; একটু হেলিলে বা বারেক মাত্র পা খানি মাটিতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া কঠিন বেত্রাঘাত করা হইত। কোন কোনও গুরু ইহার অপেক্ষাও গুরুতর শাস্তি দিতেন; তাহাকে চ্যাংদোলা বলিত। কোনও বালক প্রহারের ভয়ে পাঠশাল হইতে পালাইলে বা পাঠশালে না আসিলে এই চ্যাংদোলা সাজা পাইত। তাহা এই, তাহাকে বন্দী করিবার জন্য চারি পাঁচ জন অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক ও বলবান ছাত্র প্রেরিত হইত। তাহারা তাহাকে ঘরে, বাহিরে, পথে ঘাটে বা বৃক্ষশাখায়, যেখানে পাইত সেখান হইতে বন্দী করিয়া আনিত। আনিবার সময় তাহাকে হাঁটিয়া আসিতে দিত না, হাতে পায়ে ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিত। তাহার নাম চ্যাংদোলা। এই চ্যাংদোলা অবস্থাতে বালক পাঠশালে উপস্থিত হইবামাত্র গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে সেই অসহায় বালককে আক্রমণ করিতেন। এই প্রহার এক এক সময়ে এত গুরুতর হইত যে, হতভাগ্য বালক ভয়ে বা প্রহারের যাতনায় মলমূত্রে ক্লিন্ন হইয়া যাইত।

১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, মিষ্টার উইলিয়াম এডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালা সকলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহাতে প্রায় চতুর্দ্দশ প্রকার সাজা দিবার প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। তাহার অনেকগুলির বিবরণ শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বালক মাটিতে বসিয়া নিজের একখানা পা নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকিবে; বা তাহার হাত পা বাঁধিয়া পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া জলবিছুটী দেওয়া হইবে, সে চুলকাইতে পারিবে না; বা একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালের সঙ্গে বালককে পূরিয়া মাটিতে গড়ান হইবে এবং বালক বিড়ালের নখর ও দংষ্ট্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লাহিড়ী মহাশয়ের বাল্যকালেও যে এই সকল সাজার প্রকার ও প্রণালী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, শাস্তির ভয়ে বালকেরা অনেক সময়ে পাঠশালা হইতে পলাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিত। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ইহার কয়েক বৎসরের পরের কথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন : — "আমার সমবয়স্ক স্বসম্বন্ধীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণনগরের চৌধুরীদিগের বাটীর পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। এই পাঠশালায় আমার এক পিসতুতো ভ্রাতা ভালরূপ শিক্ষা না করাতে সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমার বাটীতে আসিতেন; কিন্তু গুরু মহাশয়ের দূতেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার অনুপায় দেখিয়া একদা এক বারওয়ারি ঘরের মাচার উপরে অনাহারে এক দিবা ও এক রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্র মধ্যে যাপন করেন। ঐ গুরুমহাশয় চৌধুরীবাটীর এক বালকের গণ্ডদেশে এরূপ বেত্রাঘাত করেন যে, তাহার চিহ্ন যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ছিল।"৭(গ)

দুই

১৭৫৭ খ্রিঃ বেনিয়া কোম্পানি পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ করলেও বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে ১৭৬৫ খ্রিঃ। ক্ষমতা হাতে নিয়ে কোম্পানি তার রাজনৈতিক কারণেই শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন আনার প্রয়াস চালায়। শিক্ষানীতিতে এদেশবাসীর মানসিক ও আত্মিক বিকাশ নয়—বরং শিক্ষাকে শোষণ ও শাসনের হাতিয়ার এবং সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করাই ছিলো উদ্দেশ্য।

বিষয়টি এখানে পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উচ্চশ্রেণী তথা অভিজাত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা, রাজনীতি, আচার আচরণ, কৃষ্টি ও বেশভূষার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিলো না। এসব বিষয় ছাড়াও রামমোহন রায়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

www.pathagar.com

> The Musalmans, as well as the more respactable classes of Hindus chiefly cultivated persian literature, a great member of the former and a few of the later also extending their studies likewise to Arabic.[৮]

ইংরেজদের এদেশে শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণের আগে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার কাঠামো ছিলো মক্তব ও মাদ্রাসায় আরবি ও পারসি আর হিন্দুদের পাঠশালায় শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় শিক্ষা। বেনিয়া সরকারও প্রথমে উভয় সম্প্রদায়কে খুশি রাখার জন্য আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। এই নীতি অনুসরণকেই বলা হয় Oriental School of Educational Policy.

১৭৮১ খ্রিঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস মাদ্রাসার জন্য ২৯,০০০ হাজার টাকার জমি মহল দান করে এবং পরে সরকারি তহবিল থেকে ৩০,০০০ হাজার টাকা বাৎসরিক মঞ্জুরি প্রদান করে। এছাড়াও ৫৭,৭৪৫ টাকায় মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ করে।

এই নীতি অনুসরণ করেই ১৭৯১ খ্রিঃ জোনাথান ডানকান বেনারসে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এর প্রাথমিক অনুদান ছিলো ১৪,০০০ হাজার টাকা। পরে তা ২০,০০০ হাজার টাকায় উন্নীত হয়। মাদ্রাসা স্থাপনে ওয়ারেন হেষ্টিংস এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে,

> 'To conciliate the Mahomedans of Calcutta.....to qualify the sons of Mahomedan gentlemen for responsible and lucrative offices in the state, and to produce competent officers for Courts of Justice to which students of the Madrassah on the production of certificates of qualification were to be drafted as vacancies occured.'[৯]

জোনাথান ডানকান যে উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন তা' তাঁর নিজের বক্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছে—

> "Two important advantages seemed direivate from such and establishement, the first to the British name and nation in its tendency towards endearing our government to the native Hindus : by our exceeding in our attention toward them and their systems, the care shown even by their own native princes.....The second principal advantag that may be derived from this institution will be felt in its effect upon the natives....by preserving and disseminating a knowledge of the Hundu law, and proving a nursery of future doctors and expounders there of the assist European judges in the due, regular and uniform administration of its genuine better and spirit to the body of the people."[১০]

ইংরেজদের প্রাথমিক শিক্ষানীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার একটি আবরণ থাকলেও এর অভ্যন্তরে মূলত রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থই প্রকাশ পেয়েছে। নূরুল্লাহ নায়েক এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—

> "Obviouisy, this school of thought was dominated by political rather than by educational considerations and decided its policies on grounds on religious neutrahty or the political expediency of conciliating the people."[১১]

www.pathagar.com

বিলেতের 'কোর্ট অব ডাইরেক্টর' ১৮৯৩ সন পর্যন্ত এদেশে আরবি ফারসি সমন্বিত প্রাচীন ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রাচ্যরীতিতে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত কলেজে অর্থ অনুদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। অন্যদিকে দেশে মিশনারিরা শিক্ষার নামে যে তৎপরতা চালায় তা' মূলত খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করে এদেশবাসীকে মূলত ধর্মান্তকরণই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। মিশনারিদের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যটি ধরা পড়েছে আমেরিকান মিশন বোর্ডের মিশনারি ডঃ ডি.ও. এ্যালেনের বক্তব্যে—

> "One reason for them is to educated the minds of the people, so that they may be more capable of understanding and appreciating the facts and evidences, the doctrines and duties of the Scriptures. Another reason for them is to increase the influence of the missionaries with the people, by communicating some advantage which they can appreciate, and by showing that Christanity rests on an intillegent perception of its doctfines and contains reason for the performance of all its duties. And another reson for such and education, is in its procuring means and opening ways of access to the people, and opportunities of preaching to them. One great difficulty which missionaries often experience, is in obtaining access to the people, in such circumstances where Christianity can be made the subject of communitcationor conversation. In such circumstances schools become very important, as a means of communication with different classes of people, wich children and parsent and with men and women. And school houses also become important as places for becoming acquainted with people, for social intercourse and religious worship, School-houses become chapels under the control of missionaries. Their use for this purpose is often more imprtant than for education."[১২]

সনাতনী ও ধর্মীয় শিক্ষা তথা আরবি-পারসি ও সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রশ্নে কোম্পানি প্রথমে কোনো উৎসাহ প্রদান করেনি। এমনকি মিশনারিদের ধর্ম প্রচার ও স্কুল স্থাপনার ব্যাপারেও কোম্পানির কোনো অনুকূল মানসিকতা ছিলো না বরং বিরূপ মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছে, পরবর্তীকালে এ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষার প্রাচ্যনীতিতে নমনীয় থাকার ফলে মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠাতারা কোম্পানির প্রতি বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ১৭৯৩ খ্রিঃ মিশনারি কাজে ও মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তারা আবেদন জানায়। উইলবার ফোর্সের প্রস্তাবের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যাক—

> "That it is the peculiar and bounden duty of the British Legislature to promote by all just and prudent means the interest and happiness of the inhabitants of the British Dominions in India : and that for there ends such measures ought to be adopted as may gradually tend to their advancement in useful knowledge and to their religious and moral imporvement."[১৩]

www.pathagar.com

প্রস্তাবে আরো বলা হয়—

> "the court of Directors of the company shall be empowered and commissioned to nominate and send out from time to time a sufficient number of skilled and suitable persons who shall attain the aforesaid object by serving as school masters, missionaries or otherwise."[১৪]

শিক্ষায় মিশনারিদের প্রভাব এবং মিশনারিদের স্কুলে দেশীয় ছাত্রদের ধর্মান্তকরণের প্রভাবের ফলে কোম্পানির প্রতি দেশীয় লোকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে মনে করে 'কোর্ট অব ডাইরেক্টর' এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। এছাড়াও এখানে অন্য একটা মানসিকতা এইভাবে কাজ করেছে যে, মিশনারিদের স্কুলগুলোতে শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারা এদেশে এলে হয়তো এদেশবাসীর মধ্যে কয়েক বছর পরই কোম্পানিকে তাড়াবার মতো উত্তেজনাকর মানসিকতার সৃষ্টি হবে। এদেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য কোম্পানির দায়দায়িত্বের প্রশ্নে স্যার জনশোর, চার্লস উড ও চার্ল গ্র্যান্ট 'Clapham Seet' নামে একটি সংগঠনের মাধ্যমে প্রবল জনমত গড়ে তোলে। এরা কোম্পানির তীব্র সমালোচনও করে। সমালোচনার কিছু অংশ—

> "Further, the English officials had, almost without exception, abanconed the principles of Christain morality. Even a Governor-General like Warren Hastings and his inconvenient rival, Philip Francis, were not ashamed to live in open adultery. Their sole connection with the Church was that once a year at Christmas or at Easter, they attended divine service in great state....overzealous Orientalists, moreover, sang the pralses of the religions of the East, especially of the then newly discovered Indian religions and systems of philosophy, and even if every one did not go so far as to declare them tobe beter and truer than Christanity, still general opinion was that they were quite good enoush for the Hindus and better adapted to their necessities that Western forms of religion."[১৫]

চার্লস গ্র্যান্টকে এদেশে আধুনিক শিক্ষার জনক বলা হয়। শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক দলিল (১৮৯২ খ্রিঃ) হলো—

> "Observations on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain, particularly with respect to morals : and the means of improving it."[১৬]

১৮৯৭ খ্রিঃ গ্র্যান্টের এই দলিল পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলে একে কেন্দ্র করে ইংলন্ডে প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এই দলিলে এদেশীয়দের অশিক্ষা ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন। এই অবস্থা থেকে ভারতীয়দের উদ্ধারের জন্য তিনি আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের কথা বলেন—

> "The cure of darkness is the introduction of light. The Hindoos err, because they are ignorant; and their errors have never fairly been laid before them. The communication of our light and knowledge of them, would prove the best remedy for their disorders: and this remedy is proposed, from a full con-

www.pathagar.com

viction that if judiciously and patiently applied, it would have great and happy effects upon them, effects honourable and advantageous for us our light and knowledge"[১৭]

চার্লস গ্র্যান্ট তাঁর দলিলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার উপর জোর দেন এবং শিক্ষানীতি ও এর বিকাশ সম্বন্ধে আরো কিছু প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি—

১. "There are two ways of making this communication : the one is, by the medium of the language of those countries : the other is by the medium of our own." তিনি ইংরেজি ভাষার সপক্ষে প্রভূত যুক্তি উপস্থাপন করার পর সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, "Thus superior in point of ultimate advantage does the employment of the English language appear : and upon this ground, we give a preference to that mode, proposing here, that the communication of our knowledge shall be made by the medium of our own language."[১৮]

২. "It would be extreamly easy for Government to establish, at a moderate expense, in various parts of the provinces, places of gratutious instruction in reading and writing English : multitudes, especially of the young, would block to them : and the easy books used in teaching, might at the same time convey obvious truths on different subjects. The teachers should be persons of knowledge, morals and discretion : and men of this character could impart to their pupils much useful information in discourse : and to facilitate the attainment of that object, they might, at first make some of the Bengalese tongue. The Hindoos would, in time, become teachers of English themselves : and the employment of our language in public business, for which every political reason remains in full force, would, in the course of another generation, make it very general throughout the country."[১৯]

৩. "The introduction of English in the Administration of the Revenue, in judicial proceedings and in other business of government, where in Persian is now used : and the establishment of free schools, for instruction in this language, would insure its diffusion over the country, for the reason already suggested that the interest of the Natives would induce them to acquire it."[২০]

৪. "With our language, much of our useful literaure might, and would, in time, be communicated. The art of printing would enable us to disseminate our writings in a way the Persians never could have done, though their com-

www.pathagar.com

positions had been as numerous as ours." "Hence the Hindoos would see the great use we make of reason on all subjects and in all affairs".[২১]

চার্লস গ্র্যান্ট তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক দলিলে ইংরেজি ভাষার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেন। কিন্তু মনে হয় তাঁর এ প্রতিবেদন মুসলিম সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে হিন্দু সম্প্রদায়কে সামনে রেখে তাদেরই প্রাধান্য দিয়ে লেখা হয়েছে—

"We proceed, then, to observe, that it is perfeetly in the power ot this country, by degrees, to impart to the Hindoos our language : afterwords, through that medium, to make them acquainted with our easy literary compositions upon a variety of subjects."[২২]

এই প্রতিবেদনে তিনি স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেন যে, ইংলন্ডের স্বার্থেই ভারতবাসীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে—

"Such education would bring about better understanding between the rulers and the ruled, would secure the gratitude of the Indian people and would ultimately lead to greater extension of British Commerce in India."[২৩]

এদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লর্ডমিন্টোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮০৬ থেকে ১৮১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি ভারতের বড়োলাট ছিলেন। প্রাচ্য সাহিত্য ও দর্শনের তিনি ছিলেন একজন অনুরক্ত ভক্ত। তিনি মনে করতেন এদেশকে শুধু পাশ্চাত্য বিদ্যা তথা জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত করলেই হবে না বরং প্রাচ্যের কাছে পাশ্চাত্যেরও শেখার মতো অনেক কিছু আছে। প্রাচ্য সাহিত্য ও দর্শন শিখলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহও উপকৃত হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত তাঁর একটি প্রতিবেদনে তিনি বলেন—

"It is a common remark that science and literature are in a progressive state of decay among the natives India. From every inquiry which I have been enabled to make on this interesting subject that remark appears to me but too well founded."[২৪]

বর্তমানে প্রাচ্যের এই অবক্ষয় ও অধঃপতন সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"The principle cause of the present neglected state of literature in India is to be traced to the want of that encouragement which was formerly afforded to it by princes, Chieftains and opalent individuals under the native governments. Such encouragements must always operate as a strong incentive to study and literary excertions, but especially in India, where the learned professions have little, if any other, support."[২৫]

তিনি আরো বলেন বৃটিশ জাতি যেহেতু প্রাচ্যের শাসনভার ও দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তাই এখন তার আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রাচ্যের এই অবক্ষয় ও অধঃপতনকে রোধ করা এবং এর গৌরবময় ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা—

"It is seriously to be lamented that a nation particularly distinguished for its love and successful cultivation of letters in

www.pathagar.com

other parts of the empire should have failed to extend its fostering care to the literature of the Hindoos and to aid in opening to the learned in Europe the repositories of the literature."[২৬]

প্রাচ্যের সাহিত্য ও দর্শনের ভক্ত লর্ড মিন্টো সরকারের কাছে আবেদন জানান তিরহুত ও নদীয়াতে হিন্দুদের জন্য আরো দু'টি সংস্কৃত কলেজ এবং ভাগলপুর ও জৈনপুরে মুসলমানদের জন্য আরো দু'টি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য।

এই সময় পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ নবায়ন প্রসঙ্গে ভারতের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আরো দু'টি বিষয়ের উত্থাপন করা হয়—

ক. ভারতবর্ষে কোম্পানির অধিকৃত এলাকার শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব মিশনারিরা গ্রহণ করবে, না কোম্পানি গ্রহণ করবে?

খ. ভারতের শিক্ষার দায়িত্ব যদি কোম্পানি গ্রহণ করে তবে এ শিক্ষার রূপ ও প্রকৃতি কেমন হবে?

প্রথম বিষয়টিতে মিশনারিরাই প্রাধান্য পায়। সেখানে বলা হয়—

"Resolved, that it is the opinion of this committee that it is the duty of this country to promote the interests and happiness of the native inhabitants of the British dominions in India, an that measures ought to be adopted as may tend to the introduction among them of useful knowledge and moral improvement. That in furtherence of the above objects sufficient facilities shall be afforded by law to persons desirous of going to, or remaining in India for the purpose of accomplishing these benevolent designs. That meant that the missionaries were to be allowed to enter India and to reside there, they might preach, found churches, and discharge all spiritual duties : in a word, they might fulfil their missionary calling in its completest and widest sense....[২৭]

দ্বিতীয় বিষয়টি প্রসঙ্গে 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরস' বিরোধিতা করে যুক্তি প্রদান করেন যে,

(ক) ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডেও শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্বভুক্ত হয়নি। (২০ বৎসর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার শিক্ষার জন্যে প্রথম ২০,০০০ পাউন্ড অনুমোদন করে।)

(খ) ব্যবসা-বাণিজ্য কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য; কোন রকম মানবিক দায়-দায়িত্ব পালন নয়। শিক্ষার মত দায়িত্ব ঘাড়ে নিলে লভ্যাংশে হাত পড়বে।

(গ) ভারতবর্ষের জনগণ শিক্ষার ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী নয়। সুতরাং দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে ঘিরে তীব্র বাদানুবাদ হয়। প্রথম সিদ্ধান্তের বিরোধীরা ভারতবর্ষে মিশনারি কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে আর একটি সরকারি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,

"It shall be lawful for the Governor-General in council to direct that out of any surplus which may remain of the rents, reveneus, and profits arising from the said territorial acquisitions, after defraying the expenses of the military, civil and

www.pathagar.com

commercial establishments and paying the interest of the dobt, in manner hereinafter provided, a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set a put and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India."[২৮]

১৮১৩ খ্রিঃ ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করে। বিপুল হারে মিশনারিরা এদেশে আসতে শুরু করে ও বিভিন্ন অঞ্চলে পাশ্চাত্য রীতিতে স্কুল চালু হয়। সেখানে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজও চলে। দেশীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এরই মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য হ্যালহেত সাহেব A Grammar of the Bengali language রচনা করেছেন, অন্যদিকে হেনরি পিট্স ফরস্টারের A vocabulary, in two parts, English and Bangalee and vice versa নামক শব্দকোষেরও প্রকাশ হয়েছে। উইলকিন্স সাহেব পঞ্চানন কর্মকারকে ছেনি কেটে অক্ষর তৈরির নিয়মকানুন শিখিয়ে দেন এবং বাংলা মুদ্রণ শিল্পে এ এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। মুদ্রণ শিল্পের যাত্রা শুরু হলে ১৭৭৮ থেকে ১৮০০ সনের মধ্যে ১৭টি ছাপাখানায় প্রায় তিনশোর মতো বই প্রকাশিত হয়।

এই সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু কিছু স্কুলও প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করেছে। মিঃ আর্চার ১৭৮০ সনে ছেলেদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ ড্রামন্ড তখন স্কুল বেশ জমিয়ে বসেছেন তিনি বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করতেন ও ক্লাশে গ্লোব ব্যবহার করতেন। ভাষাতাত্ত্বিক, প্রকৃতিবিদ ও আইনজ্ঞ উইলিয়াম জোন্সের প্রচেষ্টায় ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর জ্ঞান প্রসারের জন্য ১৭৯৪ খ্রিঃ ১৫ জানুয়ারি 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে প্রতি সপ্তাহে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত হতো।

১৭৯৩ খ্রিঃ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির প্রতিনিধি উইলিয়াম কেরী ভারতে আসেন। তার সাথে যোগ দেন মি. ওয়ার্ড ও মার্সম্যান। কেরী ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। শেষ পর্যন্ত তাঁরা শ্রীরামপুরে আস্তানা গাড়েন। এঁদেরই প্রচেষ্টায় বাংলাসহ ৩১টি ভাষায় বাইবেল অনূদিত ও মুদ্রিত হয়। এ প্রসঙ্গে M.A. Sherring বলেন—

"In no country in the world and in no period in the history of Christianity, was there ever displayed such and amount of energy in the translatin of the Sacred Scriptures from their originals into other tongues, as was exhibited by a handful of earnest men in Calcutta and Serampore in the first ten years of the present century. By their own industry and that of others in various parts of India who had caught from them inspiration for the work; during this short period, portions of the Bible, cheifly of the New Testament, had been translated and actually printed in thirty one Indian languages and dialects. Not content with their labours in this direction, they also published a great multitude of facts, the Serampore press alone issuing them in twenty languages and, in addition, books for schools and colleges."[২৯]

www.pathagar.com

তাদের প্রচেষ্টায় কোলকাতা ও শ্রীরামপুরের আশেপাশে বেশ কতোগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং আধুনিক শিক্ষার পথও সুগম হতে থাকে। প্রশাসনিক সুবিধের জন্য গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংসই প্রথম এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারিভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা তথা বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য দেশীয় ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয় ও দেশীয় ভাষা শিখেননি বলে কটকের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট মি. ব্রিষ্টোকে অপসারিত করা হয়েছিলো।[৩০]

কোম্পানি কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত এতোই তাগিদ আসে যে, ১৭৯৯ খ্রিঃ ৩ জানুয়ারি ওয়েলেসলী এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেন যে, যে সমস্ত বৃটিশ কর্মচারী ১৮০১ খ্রিঃ এর পহেলা জানুয়ারির মধ্যে দেশীয় ভাষা, আইন ও আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না করবে, তাকে আর চাকুরিতে বহাল রাখা চলবে না। বিজ্ঞপ্তির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো—

> From and after the 1st. January, 1801 no servent will be deemend eligble to any of the offices here in after mentioned, unless be shall have passed an examination the nature of which will be here after determind in the laws and regulations, and in the languages, a knowledge of which is here by declared to be an indispesible qualifications. (পাবলিক ডিপার্টমেন্টের ইস্তেহার, কোলকাতা ৩.১.১৭৯৯)

অবশেষে ইংরেজ কর্মচারদিদের দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়েলেসলী তাঁর মিনিট উপস্থাপন করেন ১৮ আগস্ট এবং কলেজের কাজ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় ২৪ নভেম্বর। ১৮ আগস্ট মিনিটের প্রস্তাবনায় কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বলা হয়—

> A college is hereby founded at Fort William in Bengal for the better instruction of the junior civil servant of the company in such branches, of literature, science and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices, constituted for the administration of the Government on the British possessions in the East Indies (কেরীর মিনিট ১৮.৮.১৮০০)

যে যে বিষয়ে ইংরেজি সিভিলিয়ানদের শিক্ষা দেয়া হবে ও শিক্ষক নিয়োগ করা হবে মিনিটে তাও উল্লেখ করা হয়—

১. ভাষা— আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেলেগু, মারাঠি, তামিল, কানাড়ি, ইউরোপের আধুনিক ভাষাসমূহ, গ্রিক, ল্যাটিন, ক্লাসিকেল ইংরেজি সাহিত্য।
২. আইন— মুসলিম আইন, হিন্দু আইন, নীতিশাস্ত্র ও আইনগ্রন্থ গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত আইনসমূহ, রাজনীতি ও অর্থনীতি।
৩. প্রাচীন আধুনিক ইতিহাস— হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের ইতিবৃত্ত, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত।
৪. বিজ্ঞান— উদ্ভিদ, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা।

কলেজে প্রথমে আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্থানী বিষয়ে ক্লাস শুরু হয়। বাংলা বিভাগ তখনো চালু হয় নি—মূল সমস্যা ছিলো বাংলার অধ্যাপক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব। বাংলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো কারো কথা কলেজ-কর্তৃপক্ষ তখনো অবগত ছিলেন না। তবে শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলায় বাইবেলের অনুবাদের জন্য ওয়েলেসলী উইলিয়াম কেরীকে জানতেন—তারই নির্দেশ মতো কলেজের প্রভোস্ট ডেবিড ব্রাউন উইলিয়াম কেরীকে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। কেরী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন এবং ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে কলেজে যোগদান করেন।

www.pathagar.com

তিন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে প্রভুত্ব স্থাপনের অনেক পরেও আধুনিক শিক্ষা প্রসারে কোনো তৎপরতা দেখায়নি— বরং বণিক মনোবৃত্তি ঔদাসীন্যই দেখিয়েছে বারবার। সুতরাং এ দেশের মানুষকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য কোম্পানি ইচ্ছে করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনো মানসিকতা দেখায়নি বরং কিছু সংখ্যক উদার ইংরেজ কর্মচারীর আগ্রহে এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলোকসম্পাতে এদেশে আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবন পিপাসার যে তাড়না এসেছিলো মূলত এরই উত্তাপে আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়।

আমাদের জানা মতে গভর্ণর স্যার জনশোরই সর্বপ্রথম এ দেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তাঁর NOTES ON INDIAN AFFAIRS এ তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন—

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ, এ দেশের অধিবাসীরা শিক্ষার অভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাদের কি এ অবস্থায়ই থাকতে দেওয়া হবে, না ইংরেজ প্রভুদের সাহায্যকারী করে গড়ে তোলার জন্য আধুনিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে?

তাঁর এ সুচিন্তিত অভিমতের মধ্যে ছিলো— শিক্ষা বিষয়ে যদি ইংরেজ সরকারের কিছু করার থাকে তবে নিম্নলিখিত সূত্রগুলোর সমাধান করতে হবে—।

১. প্রথমেই আদালতের ভাষা নির্দিষ্ট করতে হবে।
২. নতুন কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং এ দেশের মানুষকে অন্ততপক্ষে মাতৃভাষার মাধ্যমে ন্যূনতম শিক্ষা লাভের জন্য দেশীয় পাঠশালাগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে উৎসাহ দিতে হবে।
৩. এ দেশের ভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য দর্শনের গ্রন্থ অনুবাদের জন্য তাদের উৎসাহ দিতে হবে।
৪. উৎসাহী ও সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য দর্শন শিক্ষার সুব্যবস্থা করে দিতে হবে।[৩১]

আশ্চর্য, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গভর্ণর স্যার জনশোরের অভিমতগুলো বাস্তবায়নের জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি ইংরেজ সরকার। পরবর্তীকালে প্রায় কুড়ি বছর পর ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড ময়রা এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মিনিটে উল্লেখ করেন—

> আমাদের সাম্রাজ্য অধিকার বিস্তার এবং সংরক্ষণের জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ চালাতে গিয়ে অধিকারভুক্ত অঞ্চলের জনগণের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য আমরা খুবই কম সময় পেয়েছি। তাদের অবস্থা এখন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত যুদ্ধে ভারতের চারদিকে যে অনিশ্চিত অবস্থা ঘনিয়ে এসেছে এর ফলে নৈতিক চরিত্র গঠনের পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এবং অসৎ প্রবৃত্তির প্রাধান্য প্রবল হয়ে উঠেছে।[৩২]

লর্ড ময়রা অন্তর থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, একমাত্র আধুনিক শিক্ষাই এ দেশের মানুষকে নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এ দেশের টোল ও মক্তবগুলোতে যে ধরনের শিক্ষা প্রচলিত আছে এবং যে সমস্ত শিক্ষকেরা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাদান করে থাকেন— এদের মাধ্যমে কখনো আধুনিক শিক্ষা প্রচলন সম্ভব নয়। অথচ জনশিক্ষার জন্য প্রথমে এসব শিক্ষকদের উপর নির্ভর না করেও পারা যায় না। তাই লর্ড ময়রার ধারণা হয়েছিলো যে, এ দেশের টোল ও মক্তবের শিক্ষকদের দিয়ে ধর্ম ও নীতিবোধের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় জনশিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কেননা তার মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, এসব শিক্ষকেরা নামমাত্র সম্মানীর বিনিময়ে যেভাবে লেখাপড়া ও আঁক কষার প্রাথমিক জ্ঞান দান করে এর ব্যয় যে কোনো লোকের পক্ষেই বহন করা সম্ভব। এছাড়া যে ধরনের শিক্ষাদানে তাদের যোগ্যতা আছে, গ্রাম্য জমিদার, গ্রাম্য হিসেব নবীশ আর গ্রাম্য দোকানদারদের পক্ষে তাই যথেষ্ট বলে মনে হয়।'[৩৩]

www.pathagar.com

গভর্ণর স্যার জনশোরের শিক্ষা পরিকল্পনাটির মতো— মিনিটে পেশকৃত লর্ড ময়রার শিক্ষা পরিকল্পনাটিরও কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু তার 'মিনিট' পেশ করার মাত্র একমাস পরেই চার্লস নেপিয়ার এ দেশে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন—

> 'কোনো সাম্রাজ্য লাভ বা হারানোতে তো সাধারণভাবে মানুষের কিছুই করার থাকে না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অমোঘ বিধানেই সেই লাভ বা বঞ্চনায় কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। সীমাবদ্ধ অধিকার কালের মধ্যে বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য কর্মের রূপায়ণেই মানুষের কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। তাই অধীনস্থ দেশের সুখ সমৃদ্ধি সর্ববিধ ব্যবস্থাতেই শাসক জাতির সাম্রাজ্য লাভের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের ব্যাপারে ইংরেজদের ক্ষেত্রেই তাই ভারতীয় জনসাধারণের সর্বঙ্গীন উন্নতি বিধানই ইংরেজ অধিকারের সার্থকতা। তাই আমরা যদি আমাদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করতে পারি তাহলে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা আর বিশ্ববাসীর প্রশংসায় আমাদের নাম চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, ভবিষ্যৎকালে কোনো পরিবর্তনই তাকে সামান্যতমও প্রভাবিত করতে পারবে না'।[৩৪]

বৃটেনবাসীরা যখন এ দেশে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করতে ছিলো ঠিক তখনই ইংল্যান্ডের কোম্পানির কর্মকর্তা এবং পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে এ নিয়ে তর্কের ঝড় ওঠে।

এ দেশে খ্রিস্টধর্মের অবাধ প্রচার এবং ইংলন্ড থেকে এদেশে শিক্ষক প্রেরণের জন্য কোম্পানির প্রাক্তন কর্মকর্তা চার্লস গ্রান্ট পার্লামেন্ট সদস্য উইলবার ফোর্সকে অনুপ্রাণিত করে তাঁরই মাধ্যমেই পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব আনেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর সনদ পুনঃ বিবেচনার সময় তিনি আবার এ দেশে আধুনিক শিক্ষা ও খ্রিস্টধর্মের অবাধ প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঠিক এ সময়েই গ্রান্ট সাহেবের Ovservation on the State of Society Among the Asiatic Subjects of Great Britain পুস্তকটি বের হলে এর বক্তব্য পার্লামেন্টে ভারতীয় নীতির বিশেষ আলোড়ন তুলে এবং পার্লামেন্টও এ বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠে। গ্রান্ট সাহেব ভারতের খ্রিস্টধর্ম প্রচার বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করেন এবং এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা, প্রচারের পক্ষে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে ওজস্বী বক্তৃতা দেন এবং শেষ পর্যন্ত ওয়েরেন হেস্টিংস, মনরো প্রমুখ সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার মুখেও জয়ী হন। প্রস্তাবটি পার্লামেন্টে অনুমোদন লাভ করে। ফলে এ দেশে শুধু খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পথই উন্মুক্ত হয়নি— আধুনিক শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্য চর্চার জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টরের সদস্যগণ ভারত সরকারের প্রতি নিচের আদেশ প্রচার করেছিলেন—

> That a sum of not less than a lac of rupees in each year shall be set apart and applied to revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of the knowledge of the sciences among the British territories of India.[৩৫]

ভারতের মতো বিশাল দেশের জন্য এ এক লক্ষ টাকা কিছুই না— কিন্তু এখানে আমরা উপনিবেশিক সরকারের মানসিকতার এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের পরিচয় পাই। শুধু তাই নয় এখানে আধুনিক শিক্ষার একটি সম্ভাবনার আভাসও পাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ধাচে তখন এদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজি বিদ্যালয় গড়ে উঠতে শুরু করেছিলো— যেমন ভবানীপুরে জগমোহন বসুর ইংরেজি বিদ্যালয় (১৭৯৩), চুচুড়ায় পাদ্রী জেমস রবার্ট মে প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয় (১৮১৪) এবং কেরী, মার্সম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে একটি কলেজও স্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নভাবে ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সেদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে— যার ফলে দেশী ও বিদেশীদের সমবেত চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রিঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ উদ্যম থেকেই আদর্শ বিদ্যালয় ও আদর্শ শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭), 'কলকাতা সোসাইটি' (১৮১৮), বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন (১৮১৭)। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বিনামূল্যে ও সুলভে ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য রামমোহন রায় ১৮২২ খ্রিঃ এ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

চার

এদেশের আধুনিক শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসঙ্গে হিন্দু কলেজ ও ডিরোজিওর রয়েছে এক অনন্য ভূমিকা। মূলত আধুনিকতার সূত্রপাত এখান থেকেই। তাই এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়—

ডিরোজিও! উনিশ শতকের রেনেসাঁয় এ শুধু একটি নাম নয়— আধুনিক বাঙালির মানসাকাশের একটি বিপ্লব ও নতুন যুগের হৃদস্পন্দন এবং আমাদের চিন্তা ও চৈতন্যের প্রদীপ্ত সূর্য, একটি জাতির মনন জাগরণ ও আত্মজাগরণের শশবিষাণ। এ নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে হিন্দু কলেজ, ইয়ংবেঙ্গল, একাডেমিক এসাসিয়েসন ও বাংলার নব জাগরণের ইতিহাস। এসবকে বাদ দিয়ে ডিরোজিও, ডিরোজিওর মানস-বিশ্লেষণ ও স্বরূপ উন্মোচন এবং বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা সম্ভব নয়।

ডিরোজিও আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই হিন্দু কলেজের কথা উল্লেখ করতে হয়। নব্য বাংলার মানস-সংগঠন, মনন জাগরণ ও আত্মজাগরণ এবং এর ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার উৎসভূমি ছিলো হিন্দু কলেজ। মূলত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা আধুনিক বাংলার মানস সংগঠন ও সংস্কৃতি চর্চা এবং বিশ্বচিন্তা ও চৈতন্যের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ জ্ঞানতীর্থকে কেন্দ্র করেই বিদ্যা ও বিত্তের প্রাচুর্যে ঐশ্বর্যবান মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণেরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জীবন পিপাসার এবং আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ হয়— ফলে তাঁদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবন পিপাসার তাড়নায়ই সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক চেতনায় বাংলার নবযুগের উদ্ভব হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই কোলকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবন চেতনার একটা মৃদু উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন এবং জীবন চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ আর এর সার্থক উত্তাপ ও ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টিতে হিন্দু কলেজের ভূমিকা একক ও অনন্য। বাংলাদেশে উনিশ শতকের রেনেসাঁর তূর্যবাদক এ হিন্দুকলেজের ছাত্ররাই Young Bengal নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা ঐতিহাসিক রমেশ দত্তের উক্তির আশ্রয় নেবো—

> The Hindu College, which, was established in 1817 effected a revolution in the ideas of the young Hindus of the day. They imbided in that College a warm appreciation of western literature and western civilisation, and brooked with impatience the unreasoning restrictions which modern Hindu customs had imposed on them. Trained under teachers like Derozio and D. L. Richardson, the first young men who came out from the Hindu Collge were fired with ambitions to reform all that was unhealthy, and to reject all that was hurtful in Hindu customs and rules. The reactions of ages went perhaps a little to far, but we can scarcely regret this reaction to which is really due all the steady improvement and reform which have been effected in this Country. One may laugh at the anglicised young. Collegiates of the first half of

www.pathagar.com

this (19th) centurey but it was those young Collegiate whose advanced ideas and training leavened the society in which they lived and made the sober reforms of later times possibel. Men like Kashiprasad Ghosh and Ramproshad Rai lke K. M. Benerjee. Devendranath Tagore and Prosanna Kumer Tagore, were among the early students of the Hindu College and the ideas which they recerved with their English education permitted the society in which they lived. The writings of Akshay Kumar Dutta refleced the progress infused into Hindu society through the Hindu College. The reforms effected buy lswar Chandra Vidaasagar were possible only after Hindu Society had been permeatted with advanced ideas through a healthy English education.[৩৬]

উনিশ শতকের রেনেসাঁয় তথা বাঙালির জীবনচেতনা ও আধুনিকতার উৎসমূখে এ কীর্তিস্তম্ভ চিরভাস্বর মহিমায় উদ্ভাসিত। আর এ কীর্তিস্তম্ভের বিদ্রোহী সন্তানদের গুরু হলেন হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও— সতের বছরের একজন তরুণ শিক্ষক যিনি নবযুগের প্রবর্তক ও বাংলার সক্রেটিস।

হিন্দুকলেজের প্রথম আট বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে এ কলেজ ছিলো ইংরেজিতে শব্দ শিক্ষা ও বৈষয়িক কথাবার্তা মুখস্থের একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মাত্র। কারণ সে সময় যারা বেশি ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করতে পারতো এবং ইংরেজদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য চালাবার মতো কথাবার্তা বলতে পারতো তারাই ভালো চাকুরী পেতো ও আর্থিক সাফল্যের যোগ্যতা অর্জন করতো। ইংরেজি শব্দ শিক্ষা ও কথাবার্তা মুখস্থের জন্য তখন কোলকাতার বিভিন্ন মহল্লায় অনেক ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিলো। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

> সে সময় বাক্য রচনা প্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষার দিকে দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরেজি শব্দ ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে প্রধানত মনোযোগ দেওয়া হইত। যে যত অধিক ইংরেজি শব্দ ও তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করিত, ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাহার তত খ্যাতি প্রতিপত্তি হইত। এইরূপ শুনা যায় শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ সে সময়ে এই বলিয়া তাহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সার্টিফিকেট দিতো যে, এ ব্যক্তি দুইশত বা তিনশত ইংরেজি শব্দ শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন কোন বালক ইংরেজি অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া স্কুল ভাঙ্গিবার সময় নামতা ঘোষাইবার ন্যায় ইংরেজি শব্দ ঘোষাণ হইত। যথা—
>
> ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান— চাষা
> পামকিন—লাউকুমড়া, কুকুম্বার— শশা।[৩৭]

হিন্দু কলেজের শিক্ষার আবহও প্রথমে ঠিক এমনি ছিলো। অর্থাৎ ইংরেজি-শব্দজ্ঞান, সরলবাক্য রচনা, ইংরেজিতে হিসেব ও জমা খরচ রাখা এবং ইংরেজ বণিকদের বৈষয়িক কথাবার্তা শিক্ষা দেয়াই ছিলো এ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এর প্রমাণ হিসেবে আমরা তুলে ধরতে পারি যে,—

> English Education, among the inhabitants of Bengal has hitherto had little more than more language for its object a suffecint command of which for conducting the details of efficient duty, comprehended the utmost ambition of native students. The spelling book, a few reading exercises, a grammar,

www.pathagar.com

> and a dictionary formed the whole course of their reading, except in a few isolated instances of superior ability and industry little more was effected than a qualification of a copyist and an accoutant.[৩৮]

হিন্দুকলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার ঠিক এমনি আবহে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন হিন্দু কলেজের পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের এক বছর পর্যন্তও 1st class মানে সর্বোচ্চ ক্লাশের ছাত্ররা Teg এর Book of Knowlege এবং Enfield এর Speaker পড়তো। পাঠ্যসূচীতে তখনও আরবি-ফারসি বাধ্যতামূলক ছিলো। কিন্তু ঠিক এক বছর পরেই উইলসন সাহেব হিন্দু কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে, ইতিহাস, ভূগোল এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের উপর জ্ঞান লাভই হিন্দু কলেজের শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য। তাঁর ঘোষণায় বলা হয়েছে—

> The general result of the operation of the Hindu College is to give the students a considerable command of the English Language, to extend their knowledge of History, Geography and to open to them a view of the objects and means of Science.[৩৯]

হিন্দু কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচীর এ যেন এক অলৌকিক পরিবর্তন এবং এখানেই শেষ নয়— ১৮২৮ সনে উইলসন তাঁর ঘোষণায় আবার বলেন—

> Whilts those of the present first class admit of no comparision with anything yet effected buy the college, and far exceed the expectations which I then expressed to or entertained.[৪০]

এবার ছাত্রদের জন্য নতুন পাঠ্যসূচী তৈরি হলো। ফলে ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিলো জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা। এ নতুন পাঠ্যসূচীতে আমরা দেখি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সাহিত্য, মনোদর্শন বা মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy), ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, ভূতবিদ্যা (Natural Philosophy) ও ভূগোল স্থান পেয়েছে। সাহিত্যের পাঠ্যসূচীতে আছে-শেকস্‌পীয়র, মিল্টন, পোপ, হাইডেন, এডিসন, জনসন, গোল্ডস্মিথ, গ্রে, হোমার, দর্শনে-বেকন, লক, স্টুয়ার্টমিল, হার্টলি রীড, এ্যাবার ক্রম্বি, বিজ্ঞানে নিউটনের তিন শাখা (three sectsions), Optics. পোর্টারের কলবিদ্যা (Mechanics) হাইমারের জ্যোতির্বিদ্যা, হার্সেলের জ্যোতির্বিদ্যা, হলের ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, হিলের উচ্চতর গণিত ও জ্যামিতি; ইতিহাসে গ্রিক, রোম, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস— গিবন, হিউম, রবার্টসন, অর্থনীতিতে— এ্যাডাম স্মিথের সদ্য প্রকাশিত ওয়েলথ অব নেশনস্‌, ন্যায় শাস্ত্রে মিলের লজিক, হোয়াটলির লজিক, এবং লেথামের ইংরেজি ভাষা বিষয়ক রচনা পাঠ্য তালিকায় ছিলো। এ সমস্ত পাঠ্যক্রমের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারবো যে, এ শিক্ষাসূচী শুধু শব্দ ও ভাষা জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, মন-মানসিকতার সত্যিকার বিকাশ এবং চিন্তা ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করাই এ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে। তাই হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ কার লিখেছেন—They (Bacon, Milton, Adam Smith and Shakespeare) will make him a moral and intellectual being.

ইতোমধ্যে হিন্দু কলেজের আবহ অনেকটা পাল্টে গেছে— এর পালে পাশ্চাত্য হাওয়ার গতি পেয়েছে পূর্ণোদ্যমে। ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনেক অভিজ্ঞ ও সৃজনশীল অধ্যাপক যোগদান করেছেন কলেজে। ডেভিড হেয়ার সাহেবও তখন হিন্দু কলেজে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। ছাত্ররাও এবার থেকে যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও চিন্তার চৈতন্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, তথা ইংরেজি ভাষা সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে প্রগাঢ়

www.pathagar.com

অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছে। জীবন পিপাসা ও আত্মজিজ্ঞাসার তাড়নায় তারা নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় মত্ত। জীবন ও জগতকে এবার তারা চিন্তা ও চেতনার আলোকে, বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখতে চেয়েছেন।

হিন্দু কলেজের এ আবহে ডিরোজিওই ছাত্রদের কেন্দ্রবিন্দু— সৌরবলয়ের প্রধান। কারণ এসময় ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদান করেছেন। ডি. এল. রিচার্ডসনও তখন ইংরেজি সাহিত্যের সুযোগ্য শিক্ষক হিসেবে তরুণদের মনে উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। রিচার্ডসনের পাণ্ডিত্য ও হৃদয়লোকের উত্তাপে ছাত্রদের মন ফরাসীবিপ্লবের প্রেরণা ও ইংরেজি সাহিত্য-দর্শনের আলোকসম্পাতে ঝলসিত হয়ে উঠেছিলো সত্যি— কিন্তু ছাত্রদের মন থেকে যুগযুগান্তরের সংস্কারের পাষাণভার আমূল উৎপাঠন করে মুক্তবুদ্ধি ও বিশ্বচৈতন্যকে সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর মানসস্পর্শ। যুগজাগরণের এ পটভূমিতে ও বাংলার এ রেনেসাঁয় ডিরোজিও এবং রিচার্ডসনের প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ডিরোজিওই যে পাষাণ গুহাগহ্বরের বরফপিন্ডে আলোক সম্পাত করে প্লাবনধারা বইয়ে দিয়েছিলেন ও বাউন্ড প্রমিথিউসকে আনবাইন্ড করেছিলেন এ ঐতিহাসিক সত্যটি অবশ্যিই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

রিচার্ডসন-ডিরোজিও ছাড়াও হিন্দু কলেজ আরো অনেক ইতিহাসখ্যাত ও বিদগ্ধ অধ্যাপকের অধ্যাপনায় ধন্য হয়েছে, কিন্তু এঁদের মধ্যে ডিরোজিও কেবল হিন্দু কলেজের একজন নিষ্ঠাবান ও প্রতিভান অধ্যাপকই ছিলেন না।—বাংলার নবজাগরণের তিনি ছিলেন প্রদীপ্ত এক অগ্নিশিখা— তিনি ছিলেন নবযুগের প্রবর্তক। বাংলার সমাজ বিপ্লব ও ভাববিপ্লবে এবং নতুন জবিন জাগরণে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন একে অপরের পরিপূরক এবং সমগোত্রীয়। আধুনিক সাহিত্য তথা সৃজনশীল কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় ডিরোজিও মধুসূদনের পূর্বসূরী। আমরা কবি ডিরোজিওকে পরে আলোচনা করবো— এখানে তুলে ধরবো নব্যবঙ্গের গুরু সমাজ বিপ্লবী ভাববিপ্লবী ও বিদ্রোহী ডিরোজিওকে।

শিবনাথ শাস্ত্রী ডিরোজিওকে নবযুগের প্রবর্তক হিসেবে অভিহিত করেছেন, এ উক্তি একান্তভাবেই সার্থক ও শোভন। ডিরোজিও ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। তখন তিনি মাত্র ১৭ বছরের তরুণ। সৌরবলয়ের মহাকর্ষণের মতোই ছাত্রদের তিনি আকৃষ্ট করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়—

> ডিরোজিও হিন্দুকলেজে পদার্পণ করিয়াই চুম্বক যেমন লৌহকে টানে, সেইরূপ কলেজের সকল শ্রেণীর বালককে আকৃষ্ট করিয়া লইলেন।...এরূপ অপূর্ব আকর্ষণ, শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ সম্বন্ধ, কেহ কখনও দেখে নাই।...তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ তাহার চারিদিকে ঘিরিত। তিনি তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে ভালবাসিতেন। স্কুলে ছুটি হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন। তাহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি একপক্ষ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপর পক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন। এবং স্বাধীনভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি কেবল স্কুল ছুটির পর বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। তাহাদিগকে আপনার বাড়ীতে যাইতে বলিতেন। সেখানে তাহাদিগের সহিত বয়স্যভাবে মিশিতেন।[৪১]

১৭ বছরের একজন তরুণ অধ্যাপক তাঁর ছাত্রদের নিয়ে পরিবৃত হয়ে ক্লাশ করছেন, ছাত্ররা সম্মোহিত হয়ে তাঁর ভাষণ শুনছেন, এ দৃশ্যটি আজও আমাদের মানসনেত্রে ভেসে ভেসে উঠে। একজন তরুণ শিক্ষককে নিয়ে পৃথিবীতে বোধহয় আর কোনদিন এমন সমাবেশ হয়নি এবং আর কোনদিন হয়তো এমন হবেও না। কেবল পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষক হিসেবে নয় নবযুগের আদর্শ ও গুরুরূপেও ডিরোজিও নব্যবঙ্গের ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর নামে ছাত্ররাও ছিলো সম্মোহিত।

www.pathagar.com

ছাত্রদের পড়ানো তথা শিক্ষাদানে মনীষী বেকন ও ড্রামন্ড ছিলো ডিরোজিওর আদর্শ। তাঁর শিক্ষার পদ্ধতিও ছিলো অভিনব। প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নের সপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত বক্তব্যটিকে পেশ করে তিনি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ দিতেন এবং এর ভেতর থেকে মূল বৈজ্ঞানিক যুক্তির পথটি তাদের সন্ধান করে দিতে সাহায্য করতেন। তাঁর ক্লাশের মধ্য একটি রোমান্টিক ও ভাবসম্মোহক পরিবেশের সৃষ্টি হতো এবং তখন ছাত্রদের কাছেও ডিরোজিও ও তাঁর বক্তব্য বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব থাকতো না। সম্মোহিত হয়ে ছাত্ররা তাঁর কথা শুনতো। এজন্যই লালবিহারী দে ডিরোজিওর ক্লাশ সম্বন্ধে বলেছেন It was more like the Academus of Plato or Lyceum of Aristotle.[৪২]

লালবিহারী দে আরো লিখেছেন—

> হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্ররা বেকন (Bacon), লক (Locke), বার্কলে, হিউম রীড, স্টুয়ার্ট প্রমুখ দার্শনিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। এই পরিচয়ের ফলে তাঁদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সূত্রপাত হতে থাকে। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁরা প্রশ্ন করতে ও তর্ক করতে আরম্ভ করেন। তার ফলে তাঁদের অনেক প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণার মূল নড়ে যায়, বহু কালের বাছা বাছা সব আস্থার স্তম্ভ টলমল করে উঠে। এই নতুন শিক্ষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুরু ছিলেন ডিরোজিও। হিন্দুকলেজে তিনি ছাত্রদের যে ক্লাশ করতেন তার আবহাওয়াই ছিলো অন্যরকম। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি ছিলো একেবারে স্বতন্ত্র। ছাত্ররা তাঁর ক্লাশে শিক্ষার যে নতুন আস্বাদ পেতেন তা আর কোথাও বিশেষ পাওয়া যেত না। ডিরোজিও-র প্রধান লক্ষ্য ছিলো ছাত্রদের মনে তীব্র জ্ঞানানুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলা। হয়তো ছোট বিষয়ের সঙ্গে বড়ো বিষয়ের তুলনা করা হবে, কিন্তু তাহলেও ডিরোজিওর ক্লাশের সঙ্গে একমাত্র প্লেটো ও আরিস্ততলের 'আকাডেমী'র তুলনা করা যায়। ক্লাশরুমের বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে স্বভাবতই বিষয়ালোচনার স্বাচ্ছন্দ্য ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা কঠিন হতো। ডিরোজিও তাই কলেজের বাইরে তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানায় ছাত্রদের আহ্বান করতেন। সেখানকার স্বচ্ছন্দ পরিবেশে আলোচনা আরো ভালোভাবে জমে উঠতো, শিক্ষকও তাঁর ছাত্ররা সকলেই মনখুলে অভাধে কথাবার্ত বলার সুযোগ পেতেন। কিছুদিনের মধ্যে বৈঠকখানার পরিবেশও আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নয় মনে হলো। তখন তিনি ছাত্রদের নিয়ে বাইরে একটি পাঠচক্র ও বিতর্কসভা গড়ে তুললেন।[৪৩]

অতএব দেখা গেলো যে, ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদানের কয়েকমাসের মধ্যে ছাত্রদের মনে মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ ও স্বদেশপ্রেম এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আত্মজাগরণের বান ডাকে। কোনো কিছুকে যুক্তিতর্ক ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণের একটা প্রবণতাও তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো। জীবন পিপাসা ও আত্মজিজ্ঞাসার কি প্রচন্ড তাড়না তাদের মধ্যে! আর এ সময়েই হিন্দুকলেজে প্রবন্ধ, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা শুরু হতে দেখি আমরা।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের হিন্দুকলেজের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায় ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়েছে। এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণধন মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রাজকিশোর বসু প্রমুখ। হিন্দুকলজের ছাত্ররা এ সময় ভাষা ও সাহিত্য এবং জ্ঞানমনীষায় আর তথ্য যুক্তিসহকারে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে বক্তৃতায় কতোটুকু উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন এরই পরিচয় মিলবে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী রাজকিশোর বসুর বক্তৃতার শেষ অংশটুকু তুলে ধরলেই—

> "The European benefits consist solely in pecuniary assistances. Where as means are not only the same, but the gain

www.pathagar.com

of learning, which is still more susbstantial and to conclude with saying, that we are safe every way, improving in literature and sciences day by day and shall continue to do so as long as the British Patronising sway swall rule us."[৪৪]

ডিরোজিও এখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে নবযুগের রেনেসাঁর প্রবর্তক হিসেবে সৌরবলয়ের সূর্যের মতোই অধিষ্ঠিত। সনাতন হিন্দুধর্ম ও প্রথানিয়মের বিরুদ্ধে চারিদিকে ভাঙ্ ভাঙ্ রব উঠেছে, চারিদিকে বেজে উঠেছে আধুনিকতার মহাবিষাণ, দিকে দিকে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য ও বিসুভিয়াসের অগ্নিউদগীরণ। পুরাতন বৃন্তভাঙার পালা ও প্রলয়োল্লাস-নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ ও কারার লৌহকপাট ভাঙার আহ্বান-এ যেনো দামামা বাজিছে ঐ, আর ঘোষিছে নবযুগের কামান। এ সময়কার সমাজের এ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ চিত্র আঁকতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন—

> এই নবীন অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিলো। ফরাসী বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গ সকল ভারতক্ষেত্রেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাহারা শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মনও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসী বিপ্লবজনিত স্বাধীনতা প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাহাদের মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীনপ্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ এই তাহাদের মনের ভাব হইয়া দাঁড়াইল। ইহাও অতিরিক্ত পাশ্চত্য পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ। ফরাসী বিপ্লবের এই আবেগ বহু বছর ধরিয়া বঙ্গ সমাজে কার্য করিয়াছে। তাহাদের প্রভাব এই সুদূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে।[৪৫]

রাস্তাঘাটে, অলি-গলিতে, ঘরে ঘরে তরুণদের মধ্যে তখন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন আলোচনা— তাদের দীক্ষাগুরু ডিরোজিও। এ সময়ে হিন্দুকলেজের ছাত্ররা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখছে, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। এ সমস্ত প্রবন্ধ, আলোচনা ও বিতর্কে চলমান জীবন ও যুগচেতনার উত্তাপই বিশেষভাবে উত্তপ্ত হয়েছিলো।

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলেজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। ঐ বছরের বার্ষিক রিপোর্টে বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়গুলোর উপর একবার তাকালেই বুঝতে পারবো যে, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা চিন্তা ও চেতনা এবং জ্ঞান সমীক্ষায় কতোটুকু উৎকর্ষ লাভ করেছিলো।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের বিতর্কের বিষয় ছিলো—The consequence resulting to Europe and Asia by the discovery of the passage round the Cape of Good Hope. উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে নৌপথ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার কি কি সুবিধা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের বিতর্কের বিষয় ছিলো— The preference given to the public distinction or to private happiness. ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্র না সামাজিক সমৃদ্ধি অনুসরণীয় কোনটি? এসব বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গঙ্গাগোবিন্দ গাঙ্গুলি প্রমুখেরা। গঙ্গাগোবিন্দ গাঙ্গুলি বিতর্কের এক অংশে বলেছিলেন—

> A life which is not serviceable to our fewwlow creatures is not at all to be preferred to one, which has for its object the benefits of our species, and in which one is actively engaged in promoting that philanthropic end and therefore prefer public distinction because in public life tha greatest good can be done to a greater number of begains, which in private life, cannot be expected.[46]

www.pathagar.com

এ বিতর্কে মাধবচন্দ্র মল্লিকও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ বছর আরো তিনটি বিষয়ে তিন শ্রেণীর ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছিলো ও প্রবন্ধ লিখেছিলো। তৃতীয় শ্রেণীর বিষয় ছিলো The conduct of cariolanus : চতুর্থ শ্রেণীর বিষয় ছিলো—The Preferable claims to the administration of different grecian states. পঞ্চম শ্রেণীর বিষয় ছিলো—Consequence of the Britions from the Roman conquest. ডেভিড হেয়ার ডাঃ উইলসনের প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজে তখন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ডিরোজিওর গভীর জ্ঞান-মনীষা, মুক্তমন ও স্বাধীনচিন্তার আলোকে উদ্দীপ্ত পাশ্চাত্যের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারাও ছাত্রদের প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। ডিরোজিওকে নিয়ে তারা যখন তখন আলোচনায় বসেছে— কারণ ডিরোজিও তখন তরুণদের মনের একচ্ছত্র সম্রাট।

হিন্দু কলেজ তখন নবযুগের মহাতীর্থ সঙ্গম। এ মহাতীর্থের মহোৎসব চলছে ঘন ঘন আবৃত্তি, বির্তক প্রতিযোগিতা ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গঙ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র, রাধানাথ শিকদার প্রমুখেরা ইয়ং বেঙ্গলদের পুরোধায় এবং তাদেরই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতায়, প্রবন্ধ রচনায়, আবৃত্তি ও বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতে দেখি। তাঁদের বক্তৃতা ও জ্ঞান-মনীষায় অনেক বিদগ্ধ ইংরেজ পণ্ডিতও বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়েছেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের বার্ষিক উৎসবে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে ছাত্ররা ছয়টি প্রবন্ধ পাঠ করে শুনায়— প্রবন্ধগুলোর নামকরণ, লেখার মান ও প্রকাশভঙ্গি এবং ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁদের চিন্তা ও চেতনা এবং মানসিক উৎকর্ষের কি চরম বিকাশ ঘটেছিলো। প্রবন্ধগুলোর নামকরণ—

১. রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের কোনটি শ্রেষ্ঠ শাসন?
২. মানুষের সদবৃত্তিসমূহের প্রকৃত নির্ণয়কারী কে? দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য?
৩. ইতর জন্তুর নিধন কি নীতিসঙ্গত?
৪. ইউরোপীয় বা হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে কোনটি মানব জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির পক্ষে প্রকৃষ্টতর?

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন এবং এ বছরই তাঁর পদত্যাগের আগে কলেজের বার্ষিক উৎসবে ছাত্ররা তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করে। প্রবন্ধের বিষয় ছিলো—

১. উত্তরাঞ্চলে বর্বরদের আকস্মিক অভ্যুদয় এবং সেই কারণে রোমক সাম্রাজ্যের বিনাশ, সভ্যতার অগ্রগতিতে এ দুটো ঘটনার প্রভাব।
২. বিজ্ঞান অনুশীলন অপেক্ষা ভদ্র সাহিত্য অনুশীলনে ব্যক্তিবিশেষের ও জাতিবিশেষের কাছে অধিকতর সুখকর, হিতকর ও সম্মানজনক নয়।
৩. সামাজিক সন্তোষ উৎপাদনে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও সামাজিক দায়িত্ব পালন সমপ্রয়োজনীয়।

এ সমস্ত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় আমরা রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের উপস্থিতি দেখি। রাধানাথ শিকদার বলেছেন—ডিরোজিও তাঁকে দর্শনপাঠ, প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলো। উপরের প্রবন্ধ লেখকদের সকলেই—dispiayed considereable reading and very respectable powers, both of composition and reasoning.

ডিরোজিও ছিলেন 'A successful teacher of youth'। সেদিনও ডিরোজিওর চেয়ে অনেক পণ্ডিত শিক্ষক ছিলেন— কিন্তু তাঁদের নাম Roll call এর খাতা পর্যন্তই। তাঁদের বিদ্যা ও জ্ঞান ছিলো আদর্শপ্রচারের, উপদেশের ও নীতির বৃত্তে আবদ্ধ। শিক্ষকের কাজ হলো ছাত্রদের মনের হিম শীতল বরফকে গলিয়ে দেয়া, মানবিক সেতু বন্ধন আর অন্তরের বারুদ স্তূপে আগুন জ্বেলে দেয়া। ডিরোজিও তাই করেছিলেন। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে ব্যবধানের প্রাচীর তা' ভেঙেছিলেন

www.pathagar.com

ডিরোজিও। সত্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আর মিথ্যে ও অন্যায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং অধীত বিষয়কে যুগমানসের উত্তাপে সৃজনশীল করে তোলা, এই ছিলো ডিরোজিওর শিক্ষা। সত্যি কথা বলতে কি অধীত বিষয়কে সৃজনশীল করে তোলার গুণটি ছিলো আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীরও। ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এবার আমরা বিনয় ঘোষেরও উক্তির আশ্রয় নিবো—

> পুথিগত বিদ্যা কোনরকমে ছাত্রদের মাথায় ঠেসে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না ডিরোজিও। মুখস্ত করে পরীক্ষায় পাশমার্ক পাওয়া এবং প্রতিযোগিতার লটারীর মতো জয়লাভ করার যে আদর্শ, ডিরোজিও শিক্ষক হিসেবে তা আদৌ পছন্দ করতেন না। অথবা ছাত্র হিসেবে ছাত্রদেরও তাঁর প্রতি অনুরাগী হতে উপদেশ দিতেন না। তিনি বলতেন, শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানবিদ্যার অনির্বাণ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলাই শিক্ষকের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষক জীবনে তিনি এ আদর্শই মেনে চলতেন। দর্শন সাহিত্য বা যে কোনো বিষয় নিয়ে তিনি যখন আলোচনা করতেন, তখন পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে বিষয়বস্তুর অনন্ত দিগন্তে একটার পর একটা রহস্যের দ্বার উদঘাটন করতে করতে তিনি যেনো অভিযান করতেন মনে হয়। আলোচনার আকর্ষণে আত্মহারা হয়ে তিনি বিস্মৃত হতেন তাঁর গতানুগতিক কর্তব্যের কথা। ছাত্ররাও ভুলে যেতো ক্লাশের ও পাঠ্যবস্তুর বন্ধনের কথা। মনে তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্নের ঢেউ জাগতো, অজানাকে জানার, অনায়ত্তকে আয়ত্ত করার ব্যাকুলতা বাড়তো। সোৎসাহে তারা প্রশ্ন করতো, নানাদিক থেকে নানা রকম প্রশ্ন। ডিরোজিও সে উৎসাহে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাতেন। সর্বদা শিক্ষকই যে সব প্রশ্নের জবাব দিতেন তা' নয় ছাত্ররা নিজেরা প্রশ্ন করে নিজেরাই তার জবাব দেবার চেষ্টা করতো। এই বন্ধনহীন বিষয়লোচনার মধ্যে ডিরোজিওর ক্লাশটিকে আর কলেজের বাঁধাধরা ক্লাশ বলে মনে হতো না, বিতর্ক সভা বলে মতে হতো। শিক্ষাক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই ডিরোজিও তরুণ বয়সে বাংলার নবীন ছাত্র-সমাজে অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন।[৪৭]

দিনে দিনে ডিরোজিওর ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ক্লাশরুম আর কুলিয়ে উঠলো না। মুক্ত আলোচনার জন্য চাই মুক্ত অঙ্গন— চাই প্রাণের উল্লাস প্রকাশ করার মতো স্থান। প্রথমে ক্লাশ রুম থেকে আলোচনা সভা স্থানান্তরিত হলো ডিরোজিওর বাড়ির বৈঠকখানা— কিন্তু এখানেও স্থানাভাব— এবার মুক্ত আলোচনা শুরু হলো মানিকতলার শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়ির ঘরে— এখানে নিয়মিত সভা বসতো।

এ আলোচনা সভাকে কেন্দ্র করেই ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিও 'একাডেমিক এসোসিয়েসন' গঠন করেন। সভাপতি স্বয়ং ডিরোজিও এবং সম্পাদক উমাচরণ বসু। বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং বাঙালির মানস গঠন ও চিন্তা চেতনার ভুবনে একাডেমিক এসোসিয়েসনের মতো এমন আলোড়ন সৃষ্টিকারী আর একটি প্রতিষ্ঠানেরও নাম করা যায় না। হিন্দু কলেজের মতো আধুনিক বাঙালির মানসগঠন ও আত্মজাগরণের ভূমিকায় একাডেমিক এসোসিয়েশনও একক ও অনন্য। বাংলার নবজাগরণ তথা রেনেসাঁর আলোকসম্পাত শুধু হিন্দু কলেজ থেকেই নয় একাডেমিক এসোসিয়েসন থেকেও উৎসারিত হয়েছিলো।

প্রথমে শুধু হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই একাডেমিক এসোসিয়েসনের সদস্য ছিলো কিন্তু কয়েক মাস পরেই অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরুণেরাও মহাচুম্বকের দুর্বার আকর্ষণে ডিরোজিওর কাছে ছুটে এসে একাডেমিক এসোসিয়েসনের সদস্য হলো। আমরা আগেই আলোচনা করেছি হিন্দু কলেজের ছাত্র ও একাডেমিক এসোসিয়েসনের সদস্য ডিরোজিওর ভক্তরাই ইয়ং বেঙ্গল বা বিদ্রোহী বাংলা নামে পরিচিত। গোপাল হালদার বলেছেন—'ইয়ং বেঙ্গলের নামে কতোকটা অন্যায়ভাবেই পরবর্তীকালে

www.pathagar.com

মসীলিপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তারা ধূমকেতু নয়, আশ্চর্য জ্যোতিষ্ক। ...তাদের কর্ম ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সেদিনের বাঙালি সমাজে কম ব্যাপক ছিলো না আর বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তারা চিরস্মরণীয়।'[৪৮]

হিন্দু কলেজের শিক্ষা, একাডেমিক এসোসিয়েশনের আলোচনা আর ডিরোজিওর মানস সাহচর্যে ছাত্ররা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় লাভ করেছে, পরিচিত হয়েছে পাশ্চাত্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক— বেকন, লক, হিউম, মিল, কান্ট, রুশো, ভলটেয়র, দান্তে, ট্যাসো, শেকস্‌পীয়র, বায়রন, ডারউইন ও লেমার্ক প্রমুখের চিন্তাধারার সাথে। এঁরা রেনেসাঁর আলোকদূত— নবজাগরণের নকীব। তাঁদের চিন্তা ও চেতনার উত্তাপ শুধু বাংলাদেশেই নয়— সমগ্র বিশ্বেই মনন জাগরণ ও আত্মজাগরণের এবং মানবতা, দেশ-প্রেম ও মুক্তিবুদ্ধির বৈপ্লবিক আলোড়ন তুলেছিলো। পুরাতনের ভিত্ ভেঙে তাঁরা নতুন পৃথিবী ও নতুন মানুষ গড়ার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্র ও একাডেমিক এসোসিয়েসনের সদস্য ডিরোজিওর ভক্তেরা উপরে উল্লিখিত মনীষীদের বাণীতে সম্মোহিতের মতোই অনুপ্রাণিত হয়েছে। এই প্রথম এদেশে Age of Reason-এর অভ্যুদয় হয়েছে। যুগযুগান্তরের সংস্কারাচ্ছন্ন মুধ্যযুগের ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বিদীর্ণ করে এই প্রথম ঊষার আলোকরেখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ আলো দেবতার উপরে মানুষের মহিমার আলো, বিজ্ঞান, যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির আলো। ফলে দেখা গেলো মানুষের মনে, নতুন প্রশ্ন ও নতুন মূল্যবোধের অভ্যুদয় হচ্ছে। এবার স্বর্গে নয় মাটিতে মানুষের জয়যাত্রার অভিযান শুরু।

পাঁচ

এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্যোগ বেসরকারিভাবেই সক্রিয় ছিলো। এদেশে আধুনিক শিক্ষার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট (১৮১৩) এক লক্ষ টাকা অনুদান দিলেও দীর্ঘ দিন ধরে এর বিলিবণ্টনের কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। দশ বছর পর গভর্ণর জেনারেল এ্যাডাম সাহেব এদিকে নজর দেন এবং পার্লামেন্টে বরাদ্দকৃত টাকা বিলি বণ্টনের জন্য General committee of public Instruction গঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো জনশিক্ষার্থে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর পরিদর্শন করে বর্তমান জনশিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা, জনসাধারণকে উচ্চতর শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাথে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাখার শিক্ষা পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।

General Committee of Public Instruction গঠিত হয় ১৮২৩ সনে। সরকার শিক্ষাখাতের সমস্ত টাকা ও শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বভার কমিটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই কমিটি—

পাশ্চাত্য বিদ্যার পরিবর্তে প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারে মনোযোগী ও উৎসাহী হলেন। যার ফলে নদীয়া ও কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সনাতনী পদ্ধতিতে প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রামমোহন রায় ১৮২৩ সনের ১১ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে এক যুগান্তকারী চিঠি লিখেন— উক্ত চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে,

> 'সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের শিক্ষার কোনো উৎকর্ষ ঘটবে না এবং ছাত্ররাও নতুন কিছু শিখবে না। সুপ্রাচীনকাল থেকে যে ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা এবং বেদবেদান্তের পঠন-পাঠন ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাই নিয়েই প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা বারো বছর অতিবাহিত করবে। অল্পকথায়, লর্ড বেকনের পূর্বে পাশ্চাত্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তারই পুনরাবৃত্তি হবে। লর্ড বেকনের পরেই নূতন প্রণালীতে সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যে শিক্ষা পাশ্চাত্যের যুগান্তর এনেছে তার

www.pathagar.com

সঙ্গে তুলনা করলে বেকন-পূর্ব যুগের শিক্ষা এবং বর্তমানে সরকার প্রস্তাবিত সংস্কৃত শিক্ষা সহজেই অসার বলে প্রতিপন্ন হবে। ইংরেজ জাতিকে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা অভিপ্রেত হলে সে দেশে মধ্যযুগীয় স্কুলম্যানদের শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে বেকনের দর্শন চর্চার প্রবর্তন করা হত না। তেমনি ইংরেজ সরকার যদি ভারতবাসীকে অজ্ঞানের অন্ধকারে রাখতে চান,— তবে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হবে।' The Sanskrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness.' পত্রের উপসংহারে তিনি লিখলেন—

But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics. Natural Philosophy, Chemistry and Anatomy with other useful sciences.

অর্থাৎ দেশীয় জনসাধারণের উন্নতি বিধানই যেখানে সরকারের উদ্দেশ্য সেখানে গণিত, রসায়ন, শরীর বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বিষয়সমূহের মতো উদার ও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতাই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও যন্ত্রপাতির দ্বারা সুসজ্জিত একটি কলেজ এবং ইউরোপে শিক্ষিত কয়েকজন প্রতিভাবান ও পন্ডিত ব্যক্তিকে নিয়ে মঞ্জুরিকৃত অর্থের দ্বারাই সে পৃষ্ঠপোষকতা করা সম্ভব'।[৪৯]

দুঃখের বিষয় রামমোহন রায়ের এ প্রস্তাব কমিটি কোনো বিবেচনাই করেনি বরং বিলেতে থেকে শিক্ষা নীতির যে নির্দেশ এসেছিলো এতে বলা হয়েছিলো যে, যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হবে তা হবে প্রাচ্য বিজ্ঞান, সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত নীতিশিক্ষার পদ্ধতি'।

রামমোহন রায়ের এ প্রস্তাবে সরকার প্রকৃতপক্ষে কোনে সাড়া না দিলেও তিনি যে শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে আমহার্স্টকে চিঠি লিখেছিলেন এরই একটি মৃদু অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিলো দেশবাসীর মনে। এর কারণ বোধহয় এই যে, তখন দেশবাসীর মনে একটা পাশ্চাত্য চেতনার উত্তাপ সঞ্চারিত হতেছিলো। এরই প্রমাণ আমরা পাই সেদিনকার 'সুধাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। ১৮৩৩ সনের ৭ সেপ্টেম্বর উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়...[৫০]

'ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণরূপে বিদ্যাপ্রচারের নিমিত্তে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যতই লিখেন বোধ হয় গভর্ণমেন্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না।...যে বিদ্যার খরচ করা উচিত বুঝেন তদর্থেই খরচ করিতেছেন। কিন্তু এইমাত্র কহিতে পারি ঐ খরচের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্বসাধারণের কি উপকার দর্শিতেছে আমরা এ পর্যন্ত তাহার কিছু জানিতে পারি নাই।...সংস্কৃত বিদ্যালয়তে গভর্ণমেন্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্দারা সর্বসাধারণের বিশেষ উপকার নাই, কেননা সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বিদ্যাভ্যাস হয় না। যখন গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত না করিয়াছিলেন তখনও স্থানে স্থানে চতুস্পাঠী ছিল এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস নির্বাহ হইত। আর এখনও দেশে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের চতুস্পাঠী আছে। অতএব গভর্ণমেন্টের আনুকূল্য ব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের বড় ক্ষতি হয় না এবং সে বিদ্যাদ্বারা কেবল ব্যবস্থাদি দান ভিন্ন শাসনাদি কর্মেরও কোন উপকার নাই। অতএব যে বিদ্যাশিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া রাজ্যশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপণ করাই ধার্মিক দয়ালু রাজার উচিত কর্ম...কিন্তু গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন না করিলেও তাহা দূর হইবেক না।

* * *

www.pathagar.com

> গভর্ণমেন্ট যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্বক তাহার অধিকারের প্রতি গ্রামের প্রজাদের উপর যোব্রানুসারে চাঁদার আজ্ঞা করেন তবে তাঁহার আজ্ঞাবোধ কোন প্রকার হইবেক না। সুতরাং যাঁহার যেমত সাধ্য তদুনাসারে ঐ চাঁদা অবশ্যই দিবেন...অবশিষ্ট খরচ এডুকেশন কমিটি হইতে দিলেই স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিদ্যালয় চলিতে পারিবেক।[৫১]

অবশেষে এ দেশের শিক্ষানীতি প্রাচ্য না পাশ্চাত্য হবে এ নিয়ে জেনারেল কমিটিতে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। একদল ওরিএন্টেলিসট— তারা প্রাচীন প্রাচ্য আরবি ও সংস্কৃত-বিদ্যার সমর্থক এবং তারা প্রাচীন প্রাচ্য আরবি ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলো পুনঃ প্রকাশের আবেদন জানায়। অন্যদল এ্যাংলোসিস্ট, তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক, সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষার তীব্র বিরোধী।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক নানা কারণে আমাদের দেশে পরিচিত হলেও এদেশের শিক্ষানীতি, শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতাকে আমরা ভুলবে না। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধেও তাঁর একটা তাচ্ছিল্যকর মানসিকতার প্রকাশ পেয়েছে।

বেন্টিঙ্ক সাহেব আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অধিকারকে চিরতরে বঞ্চিত করে ইংরেজিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদেশ জারি করে বলেছিলেন—

> 'সুপরিষদ বড়লাট বাহাদুর মনে করেন ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চাকেই বৃটিশ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এবং যেহেতু এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহন হবার মতো উন্নত কোন ভাষা নেই তাই শিক্ষার খাতে নির্দিষ্ট সমস্ত অর্থ ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় হওয়া উচিত'।[৫২]

শিক্ষা ব্যবস্থার এ পটপরিবর্তনে পুরাতন প্রথায় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো আর টিকে থাকতে পারলো না। ফলে ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের সমস্ত অর্থ ব্যয় হলো—

> ইংরেজি শিক্ষার খাতে। স্বয়ং বড়োলাট সাহেবও ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের অর্থ ইংরেজি শিক্ষার ব্যয়ের জন্য এক আদেশ জারী করেন। তাঁর আদেশে আছে যে, এবার থেকে দেশীয় জনসাধারণকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করার জন্যও সুপরিষদ বড়োলাট সাহেব কমিটিকে অনুরোধ জানিয়েছেন।[৫৩]

শিক্ষানীতিতে সরকারের এ মানসিকতার ফলে জেনারেল কমিটিতেও অনেক পরিবর্তন হলো। কমিটির পূর্বতন সভাপতি পদত্যাগ করলেন এবং নতুন শিক্ষানীতির অনুকূলে নতুন সভাপতিও মনোনীত হলো। এ নতুন শিক্ষানীতির ফলে হিন্দু কলেজের দু'জন অধ্যাপককে কমিটির সদস্যভুক্ত করা হলো। এবং একজন মুসলমান সদস্য নির্বাচনের অধিকারও দেয়া হলো।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এবারেই প্রথম এ দেশের মানুষ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অংশ গ্রহণের অধিকার পেলো এবং সাথে সাথে এদেশে একটা জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হলো।

এবারের নতুন জেনারেল কমিটির রিপোর্টে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ আভাস পাওয়া গেলো যে, একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা কিন্তু এ দেশের কোনো ভাষাই বর্তমানে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে উপযুক্ত নয়। তাই এ দেশের ভাষাগুলোকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশের উপযুক্ত করে তোলার জন্য কমিটিকে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিলো যে,—

> এ দেশের জনসাধারণকে তাদের মাতৃভাষায় মাধ্যমে শিক্ষাদানই সর্ববাদীসম্মত উদ্দেশ্য হলেও ইতিমধ্যে শিক্ষকদের উপযুক্ত করে তুলতে হবে, উপযুক্ত ভাষা সৃষ্টি করতে হবে এবং দেশীয় সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।[৫৪]

এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত আরবি ও সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং ভবিষ্যতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু— এ নিয়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে কোন

www.pathagar.com

মতবিরোধ দেখা দিতে পারে ভেবে, নবগঠিত কমিটি একটি বিলেতের শিক্ষাপরিচালক সমিতি এ্যাংলোসিস্ট বা পাশ্চাত্য শিক্ষা সমর্থনকারীদের সমর্থন করলেও বাস্তবায়নের কোনো মানসিকতাই দেখায়নি। শেষ পর্যন্ত দু'দলের বিরোধিতা আরো চরমে উঠে— অবশেষে তা' মীমাংসার ভার পরে গভর্ণর জেনারেল সুপ্রিম কাউন্সিলের আইন সদস্য লর্ড ব্যারিংটন মেকলের উপর। ১৮৩৫ খ্রিঃ ২ ফেব্রুয়ারি মেকলে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করেন। এ দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলের অভিমত হলো—

> মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভে সুযোগ বঞ্চিত এক জাতিকে আমাদের শিক্ষা দিতে হবে। তাদের একটি বিদেশী ভাষা শেখাতেই হবে। এ বিষয়ে আমাদের নিজেদের ভাষার দাবীর পুনরুক্তির অপেক্ষা রাখে না। পাশ্চাত্য ভাষাগুলোর মধ্যে-এর স্থান সর্বাগ্রে। বাগ্মিতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এর ঐতিহাসিক রচনার চিরন্তন সৌন্দর্য আজও অনতিক্রান্ত, নীতিশিক্ষা ও রাষ্ট্র চিন্তার প্রকাশ যেমন তুলনীয় তেমনি মানুষের জীবন ও প্রকৃতির যথাযথ ও জীবন্ত উপস্থাপনাও আশ্চর্যজনক। দর্শন, ন্যায় নীতি, রাষ্ট্র চালনা ব্যবহার বিদ্যা ও বাণিজ্য চিন্তার সম্বন্ধে পূর্ণ ও নির্ভুল তথ্যও তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। পৃথিবীর প্রাজ্ঞতম জাতিগুলো যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের যে সম্পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে গেছেন— এ ভাষায় জ্ঞান থাকলে এর মধ্যে আবার প্রবেশাধিকার লাভ করা যাবে। তিনশো বছর আগেকার সমগ্র বিশ্ব সাহিত্য একত্রেও এ ভাষায় বর্তমান যুগে রচিত সাহিত্য সম্পদ অপেক্ষা যে বহুলাংশে-নিকৃষ্ট সে কথা আজ নিশ্চিন্তভাবেই বলা চলে। কেবলমাত্র তাই নয়-ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণীর ভাষা হলো ইংরেজি। উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়রাও সরকারী দপ্তরখানায় ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। সমগ্র পূর্বসাগরীয় অঞ্চলে এ ভাষা আবার ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষাও হতে চলেছে।[৫৫]

সামাজ্য বিস্তার ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার জন্য মেকলের এ প্রস্তাব অমোঘ মন্ত্রের মতোই কার্যকরী— তাই গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিক অতীব আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে মেকলের এ অভিমত সমর্থন করে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা বিষয়ক তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন।

অনেকে এমনও মন্তব্য করে থাকেন যে, মেকলেই এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন কিন্তু এ ধারণা অতীব ভুল। মেকলের আগেই রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও গ্রান্ট সাহেব এবং পাশ্চাত্য মিশনারীগণই প্রথম ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার দাবী জানিয়েছিলেন। বরং তাঁদের প্রস্তুত ভূমিতেই মেকলে সাহেব বীজ বপন করেছিলেন।

এদেশে আধুনিক শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, গ্রান্ট ও বিদ্যাসাগরের সাথে মেকলের শিক্ষানীতির পার্থক্য এখানেই যে, রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, গ্রান্ট ও বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এদেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই আধুনিক শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করতে— যা এদেশের মানুষ সহজে আত্মস্থ করতে পারবে। ফলে দেশবাসীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞান চেতনা এবং বিজ্ঞানমনস্কতার উত্তাপ সৃষ্টি হবে। আর মেকলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো প্রাচ্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমূলে উৎপাটন করে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করতে।

মেকলে ভারতবর্ষে আসেন ১৮৩৪ সনের ১০ জুন। আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসনের সভাপতি হিসেবে নিযুক্তি পান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাপন্থীদের যুক্তি তাঁর কাছে পেশ করা হয় ১৮৩৫ সনের ২ ফেব্রুয়ারি। মেকলে তাঁর মিনিটে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে এদেশে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থন করে বলেন ইংরেজি ভাষার উদ্দেশ্য সাধনাকারী একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হবে— যারা হবে Indian in Blood and Colour but English in Taste in Opinions. In Morals and in Itellect. এছাড়াও তিনি বলেন—

> Education was to filter Dowon from them to the Masses.[৫৭]

www.pathagar.com

মেকলের শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,

১. এদেশবাসীর ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের আরবি ও সংস্কৃতের প্রতি সে আকর্ষণ নেই।

২. কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গত তিন বছরে ৬০ হাজার টাকার আরবি ও সংস্কৃত বই প্রকাশ করেছে কিন্তু বইগুলো বিক্রি হয়নি অন্যদিকে স্কুল বুক সোসাইটি বছরে আট হাজার ইংরেজি বই বিক্রিই শুধু করেনি শতকরা ২০ টাকা লাভও করেছে।

৩. ১৮৩৩ খ্রিঃ এর ডিসেম্বর মাসে কোলকাতা মাদ্রাসার ছাত্র ছিলো ৭৭ জন। তাদের জন্য বৃত্তির টাকা বরাদ্দ ছিলো ৫০০ টাকা। অথচ মাদ্রাসার বহিঃ বিভাগে ইংরেজি স্কুলের ছাত্রদের জন্য কোনো বৃত্তির ব্যবস্থা তো ছিলো না-ই বরং মে, জুন, জুলাই মাসে বেতন স্বরূপ তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে ১০৩ টাকা। বৃত্তি দিয়ে আরবি পড়ায় উৎসাহ প্রদান করা হলেও আরবির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না।

৪. মেকলে সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি আবেদন পত্রের প্রতি কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছাত্রদের বক্তব্য বিষয় হলো ১০/১২ বছর তারা সংস্কৃত কলেজে হিন্দু ভাষা ও সাহিত্য এবং শাস্ত্র পড়ে পাশ করে বের হবার পর সমাজে কোন সম্মানজনক স্থান করে নিতে পারে না। পরের কৃপা কামনা ছাড়া স্বনির্ভর হবার মতো উপায় বা অবলম্বনও তাদের থাকে না। মেকলের উক্তি—

> 'They represent their education as an injury which gives them a claim on the Government for redress, as an injury for which the stipends paid to them during the infliction were a very inadequate compensation.[৫৮]

৫. মেকলে অতীব দৃঢ়তার সাথে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছেন যে, যেহেতু আরবি ও সংস্কৃত এখানকার কারো মাতৃভাষা নয় তাই ছাত্ররা আরবি ও সংস্কৃতের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণকে একটি বাড়তি জটিলতা ও বাঁধা মনে করে। ফলে তারা যা শিখে তা' জোর করে শিখে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ঐ শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারে না বলে তা' অন্তরে প্রবেশ করে না, বাহিরেই থেকে যায়।

অন্য আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য সমাজের যারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলো এবং যারা সমাজের মুখপাত্র ছিলো এমন শিক্ষিত বাঙালিরাও সেদিন মাতৃভাষা বাংলার সপক্ষে মুখ খুলেনি। আসলে মেকলের শিক্ষা পরিকল্পনায় ইংরেজ সরকারের মানসিকতাই প্রতিফলিত হয়েছিলো—

> "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the million whom we govern : a class of persons, Indian in blood and colour, but English in test, in opinion, in morals and in intettect. To that country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the western nomenclature and to render then by deqrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population."[৫৯]

মেকলে প্রস্তাব করেছিলেন আরবি-ফারসি ও সংস্কৃতের মতো অন্যোৎপাদনশীল শিক্ষা বন্ধ করে এবং ঐ সমস্ত ভাষার পুস্তক প্রকাশ না করে সমুদয় টাকা ইংরেজি শিক্ষায় ব্যয় করতে। মেকলের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১৮,০০০ হাজার হিন্দু ৮০০০ হাজার মুসলমান একটি প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেছিলেন। The Governor-General of India in Council মেকলের শিক্ষানীতির সুপারিশ মালা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে ঘোষণা করেন যে,

www.pathagar.com

"the great object of the British Government ought to be the promotion of Europian literature and science among the natives of India : and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone."[৬০]

এখানে চার্লস উডের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৮৫৪ খ্রিঃ স্যার চার্লস উড তাঁর ঐতিহাসিক 'শিক্ষা-ডেসপাস' প্রণয়ন করেন। এটি উডের ডেসপাস নামে খ্যাত। এ শিক্ষানীতিকে এদেশের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি বলা যেতে পারে। শিক্ষা বিস্তারে এখানে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরেজি ভাষার সাথে দেশীয় ভাষাসমূহকে শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব রয়েছে এখানে। স্যার চার্লস উড যে ছাড়াও তিনি তাঁর ডেসপাসে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপরিশ পেশ করেন, যেমন—

ক. বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব— ৫টি প্রদেশেই একটি ক'রে Department of Public Instruction স্থাপন করতে হবে এবং এর পরিচালনের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে একজন Director of Public Intruction এর উপর।

খ. কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে পরীক্ষা গ্রহণকারী ও ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হবে।

গ. সরকারী অর্থে আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি না করে সেই অর্থ বেসরকারী উদ্যোগকে অনুদান (grant-in-aid) দিয়ে উৎসাহিত করা হবে। অনুদান দেবার নীতিমালাও তৈরি করা হয়। উডের সুপারিশ ক্রমে ১৮৫৫ সালে Department of Public Instruction এবং ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আধুনিক অর্থে কলেজীয় শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরই শুরু হয়।

মেকলে সাহেবের সেই বিখ্যাত উক্তি—

A Single Shelf of Good European library was worth the whole native literature of India. এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল তোড়ে যখন মাতৃভাষা বাংলা ও বাংলা শিক্ষা ভেসে যাচ্ছিলো ঠিক এমনি সময়ে কিছু শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালির টনক নড়লো, বাংলাভাষার মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রাধাকান্তদেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখেরা একটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং একটি কমিটিও গঠন করে। শুধু তাই নয় উল্লেখিত ব্যক্তিগণ ডেভিড হেয়ারকে নিয়ে পাঠক্রম পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন এবং অর্থ সংগ্রহ, ছাত্রনির্বাচন ও শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতিও গ্রহণ করে। ১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ মাতৃভাষা বাংলার জন্য একটি শুভ দিন। ঐদিন এদেশের নেতৃস্থানীয় বাঙালি ও ইংরেজদের সম্মুখে বাংলা পাঠশালার শুভ উদ্বোধন হয়। সেদিন পাঠশালার অধ্যক্ষ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব আরোপ করে এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা দেখিয়ে বক্তৃতা দেন। বাংলা ভাষা যে শিক্ষার মাধ্যম হবার মতো শক্তিশালী ভাষা এ'ও তিনি যুক্তি সহকারে জোর দিয়ে বলেন। সেদিনের সভায় মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সাঙনেসী, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন সাহেবও বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন বাংলার অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মানসিকতা অনুধাবন করে লর্ডহার্ডিঞ্জ বাংলাশিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের ঘোষণা মোতাবেক সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন জেনে এদেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ও দেশাইতেষী মাত্রই আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১৮৫২ খ্রিঃ ১৯ এপ্রিল বাংলাশিক্ষার বিদ্যালয়গুলো কাউন্সিল অব এডুকেশনের কর্তৃত্বাধীনে আসে এবং এসময় থেকেই বাংলা শিক্ষার আবার দুরবস্থা সৃষ্টি হয়। বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের এ তাচ্ছিল্যকর ও উদাসীন মনোবৃত্তি এর জন্য দায়ী। এ তাচ্ছিল্যের চিত্র তুলে ধরেছেন 'ক্যালকাটা রিভিউ'—

> In Bengal with Its thirtyseven Millions. The Government Bestows Rs 8.000/- Annully on vernacular Education one-third the Salary of a collector of Revenue! As much is Expended on 200 prisoners in Jail.[৬০]

(এই বাংলাদেশ সাঁইত্রিশ মিলিয়ন লোক বাস করে। আর এদেশে বাংলা শিক্ষার জন্য সরকার বছরে মাত্র আটহাজার টাকা খরচ করেন। এ টাকা হচ্ছে একজন কালেক্টরের বার্ষিক বেতনের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। এ টাকায় জেলখানায় দু'শো কয়েদী এক বছরে পোষা হয়।)

ছয়

এতোক্ষণ আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন জনের অভিমত তুলে ধরে দেখিয়েছি যে, বেন্টিঙ্ক সাহেব প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতিতে বাংলা শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যবস্থা উৎসাদনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো।

মেকলের শিক্ষা প্রস্তাবে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি ও মনুষত্বের বিকাশ তথা—দেশ, মাটি ও মানুষের সাথে সম্পর্ক ও একাত্মতার কোন আভাসই ছিলো না। এ শিক্ষায় সাম্রাজ্য বিস্তার, ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষা, বিত্ত উপার্জন, বণিক বৃত্তির মানসিকতা, দারোগা-কেরাণী, আমলা-মোক্তার হওয়া এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার জন্য কতোগুলো যন্ত্র সৃষ্টির মাধ্যমে মাত্র। মেকলের এ শিক্ষা রিপোর্টে মাতৃভাষাকে চিরতরে নির্বাসন দেবার ইঙ্গিত যেমন সুস্পষ্ট—তেমনি ইংরেজি শিখলেই বিত্ত উপার্জনের প্রলোভনও সুস্পষ্ট। তাঁর অভিমতে আরো প্রকাশ পেয়েছে যে, এ দেশবাসী যখন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তখন অবশ্যিই ইংরেজি ভাষা শিখতে হবে—মানে মাতৃভাষার কোনো প্রয়োজন নেই।

বিবৃতিতে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন—কিন্তু কমিটি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার একটা আভাস দিলেও তা বাস্তবায়নের কোনো-পরিকল্পনাই গ্রহণ করেননি বরং ইংরেজিতে শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর দিকটাতেই জোর দিয়েছিলেন। অবশ্যি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতির জন্য কমিটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন—'মাতৃভাষার শিক্ষা এবং একটি স্বদেশী সাহিত্য সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের দিকেই আমাদের সর্ববিধ কর্মপ্রয়াস পরিচালিত হবে বলে ঘোষণা করছি'।[৬১]

বর্তমানে সাময়িকভাবে ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্যে শিক্ষাদানের সর্ববিধ-ব্যবস্থা করা হলেও ভবিষ্যতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কমিটি উল্লেখ করেন—শিক্ষা দেবার আগে এ দেশীয়দের শিক্ষা লাভ করা দরকার। তাদের মধ্যে যারা সুশিক্ষিত, নিজেদের ভাষায় রূপান্তরের আগে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের আহরণ করা কর্তব্য।[৬২]

আসলে জেনারেল কমিটির এ পরিকল্পনা শুধু কাগজি পরিকল্পনা হিসেবে ফাইলবন্দি অবস্থায়ই ছিলো। এ দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কোনো মানসিকতাই উপনিবেশিক সরকারের ছিলো না। তাদের বিভিন্ন বিবৃতির আকারে ইঙ্গিতেও তা ফুটে উঠেছে—

> আমাদের উদ্দেশ্য এমন একটি শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তোলা, যারা এরপর আমাদের আশা অনুযায়ী আহৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুটা অন্তত তাদের স্বদেশবাসীকে দান করবার ব্যবস্থা করেন।[৬৩]

জেনারেল কমিটি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো শিক্ষক গড়ার নার্সারি হিসেবে অভিহিত করে মেকেল সাহেব মন্তব্য করেছিলেন—

www.pathagar.com

> প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন বর্তমান শিক্ষকদের কেমন করে আরো দক্ষ করে তোলা যায় অথবা তাদের জায়গায় আরো যোগ্য লোক কেমন করে নিয়োগ করা যায় তা আমি বুঝে উঠতে পারছিনে। এ সমস্ত দোষ-ত্রুটির সংশোধন সময়সাপেক্ষ। আমাদের ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো স্কুল শিক্ষক গড়ার নার্সারি বিশেষ। আমরা যদি একটি সুশিক্ষিত বাংগালী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারি তবে অতি স্বাভাবিকভাবেই, তারা কোনো উগ্র রূপান্তর ছাড়াই ধীরে ধীরে বর্তমান অপদার্থ শিক্ষকদের স্থান দখল করে নেবে।[৬৪]

এরপর হতেই সরকারি নতুন শিক্ষানীতির কর্মচাঞ্চল্যের পরিধি বিস্তৃতি হলো—ব্যবস্থার ভার গ্রহণ এবং এ উদ্দেশ্য থেকেই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠিত হয়। এর সদস্যরা হচ্ছেন—ভারতীয় আইন কমিশনের সভাপতি, ভারতের আইন কমিশনার, বাংলা সেক্রেটারি ও বিশিষ্ট দুজন হিন্দু এবং ভারতীয় আইন কমিশনের সভাপতি, ভারতের আইন কমিশনার, বাংলা সরকারের সেক্রেটারি ও বিশিষ্ট দু'জন হিন্দু এবং সম্পাদক পদে নিযুক্ত হলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন সম্পাদক ডঃ এফ, জে, ময়েট।

বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকুরীরত। কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেবের সাথে বিদ্যাসাগরের খুবই অন্তরঙ্গতা ছিলো। মার্শাল সাহেবের মাধ্যমেই ময়েট সাহেবের সাথে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ ও পরিচয়। পরিচয়ের অল্পদিনের মধ্যেই ময়েট সাহেবও মার্শাল সাহেবের মতোই বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুরাগী হয়ে উঠেন। এবং দেখা গেলো যে, চার বছর পর এ ময়েট সাহেবের অনুরোধেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চূড়ান্ত সংস্কার কামনায় এর সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। আর এবার এখান থেকেই আমরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতির সাথে পরিচিত হবো।

শিক্ষা সংসদের প্রস্তাবের সুপারিশ অনুমোদন করে বাংলা সরকারের আন্ডার সেক্রেটারি বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ পত্র প্রদান করেন—

> I am directed by the Deputy Governor of Bengal to inform you that his honour has been pleased this day to appointed you to be principal of the Sanscrit on a salary of Rs. 150 per mensem.[৭৫]

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের পদ গ্রহণের সাথে সাথেই শিক্ষা সংসদের অনুরোধে শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় বিদ্যাসাগর যে নতুন শিক্ষা পরিচকল্পনা রচনা করিছিলেন, তা বাস্তবায়নে রসময় দত্তের অনিচ্ছা দেখেই মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন।

এবারে পরিকল্পনার সাথে পূর্বের পরিকল্পনার মৌল দৃষ্টির কোনো পার্থক্য নেই। তবে এ পরিকল্পনা ছিলো গভীর চিন্তা ও বিবেচনা প্রসূত। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাসংসদ বিদ্যাসাগরের উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন। এ সময়ে রসময় দত্তও পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগে শিক্ষা সংসদ সরকারকে লিখেন—

বাবু রসময় দত্ত গত দশ বছর ধরে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত আছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কোন জ্ঞান নেই বললেই হয়। তার উপর অন্য একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে সারাদিন তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কলেজের কাজের সময় ঠিক তিনি কখনই উপস্থিত থাকতে পারেন না। স্বভাবতই তাই কলেজের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হাজিরা খাতার উপর একবারেই নির্ভর করা চলে না। নানা রকমের অবস্থার ফলে কলেজের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠেছে, কাজ কর্মের ক্ষতিও হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তাতে এই অবস্থায় আশু প্রতিকার না করলে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য সম্প্রতি জন্য সম্প্রতি যে আন্দোলন শুরু হয়েছে করিৎকর্মা লোকের হাতে পড়লে সংস্কৃত কলেজটিকে তার শক্তিশালী সহায়ক হিসাবে স্বচ্ছন্দেই গড়ে তোলা যায়।[৬৬]

বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগের ফলে কলেজে পুণর্গঠনের প্রধান অন্তরায় সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালীই বিদ্যাসাগর (১৮৫০,১০ ডিসেম্বর) শিক্ষা সংসদের কাছে তার রচিত নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন।

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষা সংসদ বিদ্যাসাগরের উপর সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে প্রথমেই সংস্কৃত কলেজের উন্নতি ও আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনা এবং কলেজের আধুনিকতায় রূপ দিতে মানোনিবেশ করেন। এবং এরই আলোকে তিনি ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ১২ এপ্রিল Notes on Sanskrit College নামে ২৬ পরিচ্ছদে সম্বলিত একটি বিরাট পরিকল্পনা শিক্ষা সংসদের কাছে পেশ করেন। প্রতিটি পরিচ্ছদেহ একে একে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্য তালিকা কি এবং কেমন হওয়া উচিত। এ পরিকল্পনাটিতে একদিকে তিনি বাংলাদেশের নব্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্যটি তুলে ধরেছেন অপরদিকে মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা লাভ ও সাহিত্যচর্চার প্রতি বিদ্যাসাগরের মানসিকতা অতীব সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পরিকল্পনাটি আমরা এখানে তুলে ধরছি—

১ ঃ বাংলাদেশে শিক্ষা তত্ত্ববধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২ ঃ যাঁরা ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলোকে ভাব গম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেই জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৩ ঃ যারা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেই জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষা প্রয়োজন।

৪ ঃ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যাঁরা কেবল ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী; তাহারা সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এতবেশী ইংরেজি ভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও, পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোনো ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫ ঃ তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

৬ ঃ পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজের কি ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৭ ঃ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের খুব ভালোভাবে ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য নাটক ও গদ্য সবই থাকবে।

৮ ঃ এই শিক্ষার আর একটি সুবিধা হল এই যে, পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, Tecnical word জানা দরকার, তা পন্ডিতদের আয়ত্বে থাকবে।

এ পরিকল্পনার প্রথম পরিচ্ছদেই বিদ্যাসাগর মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার প্রতি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং তিনি আরো বলেছেন—যাঁদের উপর বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ক কর্তৃত্ব ন্যাস্ত হয়েছে, একটি উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত'।[৬৭]

www.pathagar.com

বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে অনুভব ও উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা হিন্দু বা মুসলমানের জন্য নয়, শিক্ষা মানুষের জন্য; উদার হৃদয়বান ও সচেতন মানবিক বিবেকসম্পন্ন মানুষ তৈরির জন্য। শুধু কয়েকটি পরীক্ষা পাশ করে অহঙ্কার ও দম্ভ প্রকাশ এবং অর্থোপার্জনই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। উদার মুক্ত ও সচেতন মানবতাবোধের উদ্বোধনে চরিত্র গঠনের মাধ্যমে দেশ ও দেশের মাটি এবং মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসা মানেই দেশপ্রেম। একমাত্র চরিত্রবান মানুষই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিত্ত অর্জনের মাধ্যমে এবং অন্তরের ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, সমাজ, জাতি ও বিশ্বজগতের কল্যাণ কামনা করতে পারে। কোম্পানি প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় অহঙ্কার প্রদর্শন ও বিত্ত উপার্জনের পথ আছে—কিন্তু মনুষত্বের বিকাশ ও দেশাত্মবোধের কোনো জ্ঞান নেই। বিদ্যাসাগরই তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় আমাদের প্রতি এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাই বিদ্যাসাগরের এ উক্তির সত্যতা আমরা খুঁজে পাই—

> 'কলেজ (অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজ) স্থাপনের প্রস্তাবের পিছনে, সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ক্ষেত্রেও, দ্বিবিধ উদ্দেশ্য কার্যকরী ছিল : প্রথমত:, এ দেশে সাহিত্য রচনায় উৎসাহ প্রদান করে ভারতীয়দের মনে আমাদের অনুকূলে একটি প্রবণতা সৃষ্টি করা, এবং দ্বিতীয়ত:, প্রয়োজনীয় শিক্ষার উন্নতি বিধান করা'।[৬৮]

কোম্পানির শিক্ষা পরিকল্পনা যে ভুল ছিলো-তা'ও শেষ পর্যন্ত—যথার্থ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে—

আমরা আশঙ্কা করছি, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতিধানের দিকে এখন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, তাদের মূল এবং আদি পরিকল্পনাই ছিলো ভুল। হিন্দুবিদ্যা বা মুসলমানবিদ্যা শিক্ষাদানই তাদের বিদ্যালয় স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিলো না, উচিত ছিলো প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের চিন্তা করা।[৬৯]

শিক্ষা বিষয়ে এ সমস্ত মন্তব্য ও সতর্কতা সত্ত্বেও মাতৃভাষার উন্নতি সাধন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যাপারে মূলত ইংরেজ সকারের কোনো সচেতন ও সদিচ্ছা ছিলো না। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ৭ মার্চের সরকারি আদেশ জারিতেও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কোনো উল্লেখ ছিলো না। বিতর্ক ও সমস্যা ছিলো আরবি ও সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। মাঝে মাঝে বেসরকারি বা ব্যক্তিগত ভাবে কারো পক্ষ থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষীণ আওয়াজ ধ্বনিত হলেও ঔপনিবেশিক সরকার সবসময়ই মাতৃভাষার দাবিকে অস্বীকার করে ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষাদানের রায় দিয়েছেন। জেনারেল কমিটিতেও যতোবার মাতৃভাষার দাবি উঠেছে ততোবারই তা' উপেক্ষিত হয়ে ইংরেজির প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে।

উনিশ শতকে এদেশে বিদ্যাসাগর এমনি একজন বিচক্ষণ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি প্রকৃতপক্ষে ও যথার্থভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টিকে যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি শুধু তুলেই ধরেননি—তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম পরিচ্ছদেই তিনি বহু কথিত ও অবহেলিত এবং উপেক্ষিত উদ্দেশ্যটিকে—অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের আদর্শটিকে সরকারি শিক্ষানীতির মধ্যে অগ্রাধিকার দিতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

এদেশে মাতৃভাষা বাংলাকে সর্বাধিক আধুনিক শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রয়োজনের পক্ষে পালনীয় শর্তের উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর যা বলেছেন তা' যথার্থভাবেই বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন—

> 'পাশ্চাত্য সূত্র থেকে আহৃত তথ্যকে সুন্দর, স্পষ্ট ও বাগবিধিসম্পত বাংলায় প্রকাশে অক্ষম ব্যক্তিদের প্রয়াসে সে সাহিত্য কখনো গড়ে উঠতে পারে না।'[৭০]

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, ঔপনিবেশক সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে শিক্ষা মাধ্যম ইংরেজি—অপরদিকে হিন্দু শিক্ষা ও মুসলমান শিক্ষার প্রতি বেশি জোর দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্মিলন ঘটিয়ে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাই যথার্থভাবে গ্রহণ করা হয়নি।

www.pathagar.com

বিদ্যাসাগর দুইএর মধ্যে প্রয়োজনীয় অথচ সুষম ও সুদূর প্রসারী মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আহরণ করেই সুন্দর সাবলীল সর্বভাব প্রকাশক্ষম বিশিষ্ট স্বদেশীরীতির বাংলা ভাষায় তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ কামনাই সেই মিলনের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন। তার ফলে মাতৃভাষার প্রতি খুব মনে মনে শ্রদ্ধা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যায় তার জ্ঞান লাভ তার যেমন পরোক্ষ লাভ হবে, মাতৃভাষার মাধ্যমে মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণও তেমনি তাকে সর্ববিধ উন্মার্গগামিতা থেকে রক্ষা করবে।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরেজির প্রকৃতিগত গুরুত্ব নির্ণয় করে বলেছিলেন এ দুটির উদ্দেশ্য ভিন্নমুখী। মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ইংরেজি থেকে আমাদের ভাব সম্পদ গ্রহণ করতে হবে আর সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করতে হবে অফুরন্ত শব্দসম্ভার। তাই এদেশীয় শিক্ষার্থীদের প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করতে হবে এবং সাথে সাথে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করলে তবেই প্রকৃত সার্থকতা আসবে। মাতৃভাষাকে উন্নত ও ঐশ্বর্যময় করে তুলতে হলে সংস্কৃত ও ইংরেজি কোনটাকেই উপেক্ষা করা চলবেনা। সংস্কৃতের অফুরন্ত শব্দ ভাণ্ডারের কাছে আমাদের হাত পাততেই হবে। কারণ 'ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষা সম্প্রদায় অপেক্ষা বাংলাই সংস্কৃতের অধিকতর নিকট বলে ধরা ধরা যেতে পারে।...এই ভাষার শব্দ সম্পর্কীয় সম্ভারের পাঁচ ভাগের চার ভাগই হলো বিশুদ্ধ সংস্কৃত। একেবারে যথাযথ ভাবে ভাব প্রকাশের জন্যে অসংখ্য শব্দ সৃষ্টির সাবলীল ক্ষমতাই তার শব্দ প্রাচুর্যের বিশেষ কারণ' মধুসূদনও প্যারীচাঁদকে বলেছিলেন—

> It is the language of Fisherman, unless you import largely from Sanskirt.[৭১]

কিন্তু শুধু শব্দ সম্ভারের প্রাচুর্যেই হবে না—ভাবসম্পদেরও ঐশ্বর্য থাকা চাই। আধুনিক জীবন চেতনায় মুক্তি এবং জীবন পিপাসা ও আত্মজিজ্ঞাসার যে আলোড়ন সমগ্র পৃথিবীময় আজ প্রচণ্ড উল্লাসে প্লাবন জোয়ারের সৃষ্টি করেছে ইংরেজি সাহিত্য-ভাব সম্পদে ঋদ্ধবাণ হবার জন্য সে ইংরেজি সাহিত্যের কাছেও আজ আমাদের হাত পাততে হবে।

বিদ্যাসাগর জীবনে কখনো হিন্দু বা মুসলমান এ ধরনের মানসিকতার প্রশ্রয় দেননি। এক উদার মানবিক চেতনা থেকেই তিনি বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের কথা চিন্তা করেছেন। এবং তিনি এও ভালো করে জানতেন যে, একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা' সম্ভব। বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন সাহেব হয়ে যাবার জন্য বা শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয়—আধুনিক সভ্যতা তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য দর্শনের আলোকে মাতৃভাষার মাধ্যমে আমাদের সমগ্র দেশের মানুষের চিত্তলোকে ছড়িয়ে দেবার জন্য। শিক্ষা পরিকল্পনার পঞ্চম পরিচ্ছদে এ জন্যই তিনি বলেছেন—

এখন এটা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা যায়, তারা একটি সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করবে।

পাঠ্যসূচির পরিবর্তনেও বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলো। তাঁর এ বৈপ্লবিক চিন্তাধারা একদিকে সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন পন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে অপরদিকে দেশের সবকিছুকেই অস্বীকার করার মানসিকতা সম্পন্ন Yong Bengalদের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ যারা মনে করে প্রাচ্যবিদ্যা ছাড়া অন্য কোন বিদ্যা নেই তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা দেশের মাটি মানুষ ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে একমাত্র পাশ্চাত্য বিদ্যাকেই বড়ো করে তাদের বিরুদ্ধেও।

বিদ্যাসাগর ভালো করেই বুঝেছিলেন যে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা ডিঙ্গিয়ে ইংরেজ আমাদের দেশে এসেছে কোনো মানবিক কারণে বা এ দেশের কল্যাণের জন্য নয়। বণিক বৃত্তি ও এদেশের সম্পদ শোষণই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। রামমোহন-দ্বারকানাথ, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁরা সকলেই প্রথমে ইংরেজকে এদেশের সভ্যতার এজেন্ট হিসেবে অভিহিত

www.pathagar.com

করেছিলেন। রামমোহনতো মনে করতেন ইংরেজ এদেশে চল্লিশ বছরের বেশি থাকবে না এবং এদেশের মানুষ ইংরেজি সভ্যতার সাথে পরিচিত হলেই তারা চলে যাবে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথও এ মানসিকতা হতে বিমুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর এ ভুল করেননি। তিনি সত্যই বুঝেছিলেন যে, ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে মৌখিক সহানুভূতি ও পরিকল্পনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং ফাইলের আড়ম্বর ছাড়া বাস্তব কিছু প্রত্যাশা করা যায় না।

বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার মৌল বিষয় ছিলো দেশের মাটি ও মানুষের জীবন আকর সম্পৃক্ত। তাই সেদিন কোনো কোনো আরবি বা সংস্কৃত ও মানুষের কেহ কেহ ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে তত্ত্ব ঘোষণা করেছিলো বিদ্যাসাগর এর কোনটাই সমর্থন করেননি। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় ছিলো দেশের মাটি আর জীবন সম্পৃক্ত হয়ে স্বাজাত্যবোধ ও দেশী মানুষ গড়ে তোলা। কিন্তু এটাও বিদ্যাসাগর বুঝতেন যে, বণিক সরকার তাঁর এ স্বাতন্ত্র্যবোধ বুঝতে পারলে হয়তো তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

এদেশে ইংরেজের শিক্ষা বিষয়ক একটি পরিকল্পনা ছিলো যে, এদেশের শিক্ষায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমানদের যদি ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় তবে তারাই মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছিয়ে দেবে। বিদ্যাসাগর এ সুযোগটুকু গ্রহণ করে একটু কৌশলে তিনি তাঁর পরিকল্পনায় বলেন—

> আমি আরো জানতে চাই যে, যদি বাংলাদেশের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের একটি বিস্তৃত ও উন্নত নিয়ম বিধি অনুসরণ করতে হয়, এবং ক্রমবর্ধমান উন্নত বাংলা শিক্ষকের চাহিদা মেটাতে সংস্কৃত কলেজকে যদি একটি নর্মাল স্কুল হিসেবে গ্রহণ করা হয়, বর্তমান শ্রেণীগুলির সম্প্রসারণ ভিন্ন সেই চাহিদা কোনক্রমেই মেটানো যাবে না।[৭২]

এতে কিন্তু ইংরেজ সরকারও বিদ্যাসাগরের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। Notes on Sanskrit College নামক শিক্ষা পরিকল্পনাটি একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং মাতৃভাষায় মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকতায় উত্তরণই ছিলো বিদ্যাসাগরের হৃদস্পন্দন। তাই বাংলা ভাষার ভিত্তিকে তিনি গোড়া থেকেই শক্ত করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ভালো করেই বুঝতেন যে, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমদানী করে তা ছাত্রদের মুখস্থ করিয়ে—কয়েকজন বঙ্গ সন্তানকে শুধু পোষাকী সাহেব সাজিয়ে দিলেই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার কোনো উন্নতি হবে না এবং তাদের কাছে দেশপ্রেমও প্রত্যাশা করা যায় না। এজন্যই বিদ্যাসাগর চেষ্টা চালিয়েছিলেন পাশ্চাত্য বিদ্যাকে আত্মস্থ করে তা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে—এবং তাহলেই প্রকৃত পক্ষে আমাদের নবজাগরণ আসবে। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি—এজন্যই বিদ্যাসাগর নতুন চিন্তা ও চেতনা এবং ভাবসম্পদের জন্য ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন সাহিত্যকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছেন—আর মাতৃভাষাকে তা' বহনের উপযুক্ত করে তোলার সংগ্রাম চালিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের এ মানসিকতা ছোটলাট সাদরে ও শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিলেন এবং গভীর প্রত্যয় ভরে তা শিক্ষা সংসদে পাঠিয়ে এ মন্তব্যই রেখেছিলেন—

> The accompanying paper has been drawn up by the principal of the Sanskrit College at my request.
> It is the result of several consultation I have held with the principal and. I lay it before the council as deserving in my humble judgement of very careful consideration.[৭৩]

বিদ্যাসাগরের এ শিক্ষা পরিকল্পনা পরীক্ষণের জন্য শিক্ষা সংসদের আমন্ত্রণক্রমে এলেন বারানসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন সাহেব। কিন্তু ডঃ ব্যালেন্টইন বিদ্যাসারের শিক্ষা পরিকল্পনার উপর যে অভিমত পেশ করেন এতে বুঝা যায় যে, তিনি বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনাটি সম্যক

www.pathagar.com

উপলব্ধি করতে পারেননি। ফলে বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংসদকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেন। চিঠির শেষ অংশটুকু এখানে তুলে ধরছি।

> 'অবশেষে আমি সবিনয়ে শুধু এইটুকুই নিবেদন করতে চাই যে আমাকে যদি আমার নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ দেওয়া হয়, তাহলে সংসদের কাছে এইটুকু আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, সংস্কৃত কলেজ কেবল যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শ পীঠস্থান হবে তাই নয়, মাতৃভাষা চর্চারও প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এমন একদল ভবিষ্যতের শিক্ষক তৈরি হবে এখান থেকে, যাঁরা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের পথ সুগম করবেন।'[৭৪]

শিক্ষা সংসদ বিদ্যাসাগর ও ব্যালেন্টাইনের চিঠি দু'টি পড়ে— বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটি যথাযথভাবে বাস্তব ও সার্থক এবং গ্রহণযোগ্য মনে করেও তাঁর প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব না দিয়ে ব্যালেন্টাইনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংসদের এ মন্তব্যে ক্ষুব্ধ এবং মনক্ষুণ্ন হলেন। তিনি আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সব সময়ই সজাগ ছিলেন। শিক্ষা সংসদের এ অবিচেনা প্রসূত মন্তব্যে বিদ্যাসাগর সত্যিই বুঝতে পারলেন যে,— শিক্ষা সংসদ তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার উপর অনাস্থা ও অশ্রদ্ধারই প্রদর্শন করেছে। এ যেনো সত্যিই তাঁর আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত। তাই তিনি একটি আধাসরকারি চিঠিতে শিক্ষা সংসদের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবকে লিখেন—

'ডঃ ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট শিক্ষা সংসদের নির্দেশ আমি ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছি যদি এই নির্দেশগুলি আমাকে বর্ণে বর্ণে পালন করতে হয়, তাহলে কলেজে আমার নিজের মর্যাদাই যে ক্ষুণ্ন হবে তা নয়, আমার শিক্ষার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতাও অনেকখানি কমে যাবে।'

'কলেজ বন্ধ হবে বলে এবং ছুটির বন্ধে আমার দেশে যাবার তাড়াহুড়ার মধ্যে আমি আপনাকে সরকারিভাবে যা লেখা উচিত তা এখন লিখতে পারলাম না। তা হলেও কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাবার আগে ডঃ ব্যালেন্টাইনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমার দুই-একটি গুরুতর অভিযোগ আমি আপনার কাছে নিবেদন ক'রে যেতে চাই।

'এখানে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্নও আছে। আমার নিজের চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনা সম্বন্ধে অথবা আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষা উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে আমি অন্য প্রতিষ্ঠানের একজন সমপদস্থ অধ্যক্ষের সঙ্গে মতামতের বিনিময় করব কি-না, এমন কোনো শর্ত মেনে কোনো আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি কাজ করা সম্ভব?'

'যাই হোক, আগেই বলেছি এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন, এবং নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রকৃতির ব্যাপার। আমার তো মনে হয় না কোনো শিক্ষিত ইংরেজ এই ধরনের শর্ত মেনে নিয়ে কাজ করতে রাজি হতেন। ব্যক্তিগত প্রশ্ন এ-চিঠিতে তুলব না। এবারে কাজের কথা বলছি।'

'আমার মনে হয় ডঃ ব্যালেন্টাইন এই ধারণা থেকে তাঁর পরিকল্পনা রচনা করেছেন যাঁরা ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় বিদ্যাই শিক্ষা করবেন, তাঁদের মনে সত্যের দ্বিবিধতা সম্বন্ধে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে তা তাঁর শিক্ষাধারা অনুসৃত হলে সংশোধিত হবে আমি অবশ্য জানিনা, বারানসীর শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে ডঃ ব্যালেন্টাইনের কি অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে আমাদের এখানে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমি বলতে পারি, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন এমন একজন ইংরেজ শিক্ষিত লোকও বাংলাদেশে নেই যিনি মনে করেন সত্য দ্বিবিধ।'[৭৫]

'আমার বক্তব্য হল, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে দিন প্রধানতঃ বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য। তার সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত্ব করার সুযোগ দিন। এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি যে, সংসদের পণ্ডিত যুবক তৈরী করে দিতে পারব, যাঁরা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিদ্যার প্রসারে, আপনাদের

www.pathagar.com

প্রাচ্য-বিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজি বিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে, অনেক বেশী সাহায্য করতে পারবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হবে,—আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম উদ্দেশ্য (বিদ্যাসাগর 'darling object' বলেছেন)[৫৪]-আমাকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা চলবে না (রূঢ় কথার জন্য মার্জনা করবেন, 'excuse the strong word') ডঃ ব্যালেন্টাইনের যে-সব বই বা সারগ্রন্থ আমি ভাল বিবেচনা করব, Novam organum গ্রন্থের চমৎকার ইংরেজি সংস্করণ, তা আমি নিশ্চয়ই সাগ্রহে বিদ্যালয়ে পাঠ্য করব। কিন্তু তাঁর সংকলন বা রচনা পাঠ্য হওয়ার যোগ্য কি-না, বিশেষ ক'রে আমার অনুসৃত শিক্ষানীতির সঙ্গে সেগুলি খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে কি-না, তা বিচার করার এবং বিচারান্তে সাব্যস্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে আমার থাকবে। তা যদি না থাকে তাহ'লে আমার অধ্যক্ষতার প্রয়োজন কি? এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি অনুযায়ী চললে আমার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হবে না। শিক্ষা সংসদের বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসাবে আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই দায়িত্ববোধ পর্যন্ত কমে যাবে, এবং আমার ভয় হয় নষ্টও হয়ে যেতে পারে।'

'আমি আশা করি, অত্যন্ত দ্রুত ব্যস্ততার সঙ্গে লেখা আমার এই মতামতগুলি শিক্ষাসংসদের সহৃদয় ও উদার বিবেচনার যোগ্য বলে গৃহীত হবে, এবং সংসদ তাঁদের গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনা ক'রে সংশোধন করবেন এই মর্মে যে, ডাঃ ব্যালেন্টাইনের প্রস্তাবিত পাঠ বিষয় আমি আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকব না। যদি প্রয়োজন হয়, ছুটির পর কলেজ খুললে, এ বিষয়ে সরকারীভাবে আরও স্পষ্ট ক'রে আপনাকে চিঠি লিখে জানাতে পারি।'[৭৬]

বিদ্যাসাগরের এ চিঠির পর তাঁকে আর সরকারিভাবে লিখতে হয়নি। তাঁর তীব্র জেদ ও প্রতিবাদের কাছে শিক্ষা সংসদ শেষ পর্যন্ত নমনীয় হয়ে শিক্ষা পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেছিলেন। শিক্ষা সংসদ তাঁর কর্মদক্ষতা ও শিক্ষা-পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলেই ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে তাঁর বেতন বাড়িয়ে তিনশত টাকায় উন্নীত করা হয়। এবং ১৮৫৫-৫৬ এর শিক্ষা সংসদের ডি, পি, আই, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে লিখেন—

> 'ইদানিংকালে আধুনিক চিন্তা ও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার ব্যবহারানুগ সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত শিক্ষাক্রম সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত সক্ষম অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে আর তাতে সুফলও মিলছে, নিম্নতম শ্রেণীগুলির শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব কোন মতেই বাড়িয়ে বলা চলে না।'[৭৭]

বিদ্যাসাগর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন—আর জীবনে ও মননে এবং চিন্তা ও চেতনায় তিনি ছিলেন আধুনিক। তাই পোষাকে তাঁর এ আধুনিকতাকে বাইরে প্রকাশের কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। বিনয় ঘোষ এজন্যই বলেছেন যে—,

> 'উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে একমাত্র বিদ্যাসাগরই ছিলেন বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রম। জীবনের প্রত্যেকটি কাজকর্মের মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্বই সবসময় ফুটে উঠত, সেই বিশেষত্ব হলো individuality, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্যকে তিনি খণ্ডিত করেননি। আধুনিক ইউরোপের বীজমন্ত্রটি তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলে, বাইরের পোষাক-পরিচ্ছদে বা আচার ব্যবহারে তা' তিনি কোনোদিন প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রকাশ করেছেন তাঁর চরিত্রে। ইংরেজি কেতাদুরস্ত ইয়ং বেঙ্গল দল ছিলেন অন্তরে বাঙালি, চরিত্রে বাঙালি, বাইরে ইউরোপীয়। ভাব প্রবণতা, উচ্ছ্বাস ও আবেগ সর্বস্বতাই ছিল তাঁদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগর ছিলেন মনে প্রাণে আধুনিক ইউরোপীয় এবং তার জন্য বাইরের বাঙালিত্বটুকু তিনি বর্জন করেননি। বাঙালি থেকেও তিনি পরিপূর্ণ রূপে ইউরোপীয় ব্যক্তিসত্তাকে নিজের সত্তার মধ্যে বিলীন করে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে আর কেউ বোধ হয় আধুনিক ইউরোপীয় ভাবধারাকে নিজের চরিত্রে এমন ভাবে আত্মসাৎ করতে পারেননি।[৭৮]

শিক্ষা পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগর বাস্তব অবিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা জগতে টোলের পণ্ডিতদের মানসিকতা ও টোলের শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না। তাই আধুনিক শিক্ষায় তিনি টোলের পণ্ডিত ও টোলের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো আস্থা রাখতে পারেননি—তেমনি তিনি পছন্দ করতেন না দেশের মাটি ও ঐতিহ্যবিচ্যুত উগ্র আধুনিক Young Bengal-দের। যারা বলতো If there any thing that we hate from the bottom of our heart it is Hinduism.[৭৯]

মাতৃভাষা বাংলার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতি তাঁর জীবনের কাম্য ও লক্ষ্য হলেও তিনি কখনো বিশ্বাস করতেন না যে, প্রাচ্য বিশারদরা অথবা সংস্কৃতজ্ঞ টুলো পণ্ডিতেরা এই কাজের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তবে তিনি এই কথা বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী না হলে কারো পক্ষে বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধির জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি কোনো দেশীয় ও ভৌগলিক সীমানা মানতে চাননি কোনোদিন। বাস্তবিক জ্ঞানবিদ্যার কোনো সীমানা বা কোনো রাষ্ট্রিক বন্ধন নেই। তাই তিনি প্রাচ্যবিদ ও পাশ্চাত্যবিদ দুই দলের পণ্ডিতদের কারো মতামতে কোনোদিন সাড়া দিতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে বিদ্যার আবার 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য' কি! যদি উৎস বা চর্চার দিক থেকে বিদ্যার ভৌগলিক বিচার করতে হয় তাহলে সেই বিচারেরও কি কোনো সার্থকতা থাকে? পূর্বের বিদ্যার কি পশ্চিমে, উত্তরে বা দক্ষিণে প্রসারিত হতে পারে না? আর যে বিদ্যার উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমে, পশ্চিমের পরিবেশ যার বিকাশ ও বৃদ্ধি, সে-বিদ্যা কি প্রাচ্যের তথা ভারতের ও বাংলার মাটিতে পুষ্টি লাভ করতে পারে না? সংস্কৃত কলেজটিকে তিনি কায়োমনোবাক্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যার সমন্বয় তীর্থরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দুই বিদ্যার মধ্যে ভেজাল দিয়ে তিনি একটি কিম্ভূত কিমাকার পাণ্ডিত্যের পিণ্ড পাকিয়ে বাংলার শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে চাননি। ব্যালেন্টাইনের পরিকল্পনায় কতকটা সেই নির্দেশই ছিল। তাই তিনি তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেননি। এবং গ্রহণ করার পক্ষে সংসদের যুক্তি ও অনুরোধ দুইই অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর ভালো করেই বুঝেছিলেন যে, বিদেশী বৃক্ষের বীজ দেশের মাটিতে পুঁতলে শুধু বড়ো বৃক্ষ হবে কিন্তু ফুল ও ফল কোনোটাই হবে না— এর কোনো প্রয়োজন নেই। পাশ্চাত্য বিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত ছিলো— মাতৃভাষার ভিতকে শক্ত করতে হবে— পাশ্চাত্য বিদ্যাকে আত্মস্থ করার শক্তি অর্জন করতে হবে—। দেশকে বাদ দিয়ে কখনো বিদেশী বিদ্যা আত্মস্থ করা যাবে না।

তাই 'সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ আহরণকে তিনি কোনো দিনই অবহেলা করেননি।'[৯৩] পূর্ব পুরুষের অর্জিত জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্পদকে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান বিজ্ঞান হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। এবং এ বিদ্যাকে আধুনিকতার আলোকে প্রয়োগ করে দেশ ও মাতৃভাষাকে ঐশ্বর্যময় ও ঋদ্ধ করাই ছিলো তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে বিদ্যাসাগরের এ পরিমিতিবোধ ছিলো আধুনিক জীবনচেতনা ও যুগমানসের দাবিতে কতোটুকু গ্রহণ ও বর্জন করতে হবে।

বিদ্যাসাগর এবার নতুন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য ও দর্শনকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র দেশের মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার সাধনায় তিনি ব্রতী হলেন। বিদ্যাসাগর মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন মাতৃভাষাই হচ্ছে একমাত্র জাতীয় সংহতি ও একাত্মতার মাধ্যম— এ মাতৃভাষায় মননচর্চার উৎকর্ষেই সমস্ত দীনতা, হীনতা এবং মানসিক অপচয় এবং দৈন্যতার অবসান হবে, মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যাকে আত্মস্থ করতে পারলে তবেই তার সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র গণ্ডির আবিলতা কেটে যাবে,— তাঁর মধ্যে জেগে উঠবে বিশ্বাত্মবোধ ও বিশ্বানুভূতি। এবং তখনই সে যথার্থ ভাবে মনুষ্যত্বের অধিকারী হবে। মাতৃভাষার প্রতি শ্রম ও আকর্ষণের ফলে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসাও তার গভীরতর হবে— এবং তখনই সে উদার কণ্ঠে বলতে পারবে—

'জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী'

www.pathagar.com

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা পরিকল্পনা বাঙালি জাতিকে সামনে রেখে রচিত হলেও তা ছিলো বিশ্বমুখীন। বাঙালিকে বিশ্ব জীবন মন্ত্রে অভিষিক্ত করে—যথার্থভাবে মানুষ করা ও সার্থক মানুষ করে তোলা। এ চিন্তা ও চেতনা থেকেই তিনি ময়েট সাহেবকে লিখেছিলেন—

মাতৃভাষার পূর্ণ অধিকারের মুখ্য উদ্দেশ্যে আমাকে সংস্কৃত শেখাতে দিন, তার উপর ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে গভীর জ্ঞান লাভের সুযোগ দিন আর তার ফলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, কাউন্সিলের সহায়তা ও উৎসাহ সাপেক্ষ কয়েক বছরের মধ্যেই আমি এমন একদল তরুণকে তৈরী করতে পারবো, যারা তাদের গ্রন্থ রচনা ও অধ্যাপনা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে এমন জ্ঞান গর্ভ তথ্য বিতরণ করবে যা এ তাবৎ-ইংরেজি অথবা প্রাচ্য— আপনার কোন কলেজের শিক্ষিত ছাত্রদের কর্ম প্রয়াসের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

পাঠ্যসূচীতে বাংলা অন্তর্ভুক্ত করেই বিদ্যাসাগর চুপ করে থাকেননি। উপযুক্ত শিক্ষকদের দ্বারা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার চেষ্টায় এবার তিনি উদগ্রীব হলেন। এবং সহসা সুযোগও এসে গেলো।

আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের নির্দেশে পাদ্রী উইলিয়াম এ্যাডাম নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে অতীব পরিশ্রমের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এ্যাডাম এ প্রতিবেদন তৈরি করলেও, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবলম্বীদের বিতর্কে তা' একেবারে চাপা পড়ে যায়।

পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ডহার্ডিঞ্জ ১০১টি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করে জনশিক্ষার বিপুল পৃষ্ঠপোষণা দেখান। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধায়কের অভাবে বিদ্যালয়গুলো অচল হয়ে পড়ে। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচন উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেবের সহকারী হিসেবে বিদ্যাসাগরের বাংলা বিদ্যালয়গুলো সম্বন্ধে বিপুল বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মে। এবং এ অভিজ্ঞতাই তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ পেলেন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে লেঃ গভর্ণর হ্যালিডে সাহেবের জনশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে।

হ্যালিডে সাহেবের সাথে বিদ্যাসাগরের দীর্ঘদিনের পরিচয় ও গভীর হৃদ্যতা ছিলো। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে এবং Notes on Sanskrit College নামক পরিকল্পনাটি রচনায়ও বিদ্যাসাগরকে হ্যালিডে সাহেব প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন। বাংলা শিক্ষা সংস্কার এবং পরিকল্পনার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর এবং হ্যালিডের মধ্যে ভাব ও চিন্তার বিনিময় হয়। বিদ্যাসাগরের পরামর্শক্রমেই হ্যালিডে সাহবে বাংলা শিক্ষা সংস্কারের প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন।

বাংলা শিক্ষা বিস্তারের বহু বিস্তৃত বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেবার উৎসাহ দেখে হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগরও সত্বর সে পরিকল্পনা রচনা করেন এবং এ পরিকল্পনা পড়ে হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের প্রতি এতোই মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হন যে, এতে তাঁর আর কোনো নিজস্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করার প্রয়োজন অনুভব না করে বিদ্যাসগারের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটিই তাঁর মিনিটের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ অনুরোধ করে পাঠান।

বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটিতে মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা প্রচারের এমনি বিপুল ও বিচিত্র সম্ভাবনা ছিলো যে, তাঁর সুচিন্তিত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আবেদন এবং বাংলায় শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে এর কার্যকারিতা আজও সামান্যতম হ্রাস হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। নিচে পরিকল্পনাটি তুলে ধরা হলো—

১। বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না।

www.pathagar.com

২। কেবল লিখন পঠন ও গণনা বা সরল অঙ্ক কষার মধ্যে বাংলা শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে, এবং তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতি বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞানও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আমরা আগেই আলোচনা করেছি— বিদ্যাসাগরের এ বাংলা শিক্ষা পরিকল্পনাটি পড়ে হ্যালিডে খুবই মুগ্ধ ও বিদ্যাসাগরের প্রতি অতীব শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন। এবং তিনি পরিকল্পনাটির উপর তাঁর মিনিটে এ অভিমত প্রকাশ করেন যে,—

> 'বাংলাদেশে অসংখ্য পাঠশালা আছে। এদেশের ও বিদেশের দুই শ্রেণীর লোকের কাছে অনুসন্ধান করে আমি জেনেছি পাঠশালাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ যারা সেখানে শিক্ষা দেন, তাঁরা অধিকাংশই অতি অযোগ্য ব্যক্তি।...
>
> এই পাঠশালাগুলি সংস্কার ও উন্নতি সাধন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন ছোট লাট (টোমাসন) এ-বিষয়ে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, আমাদেরও তাই করা উচিত। এমন কতকগুলি মডেল স্কুল স্থাপন করা উচিত যা এই সব পাঠশালার কাছে আদর্শ স্থানীয় হবে। নিয়মিত যদি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এই মডেল স্কুলগুলির শিক্ষাব্যবস্থা দেখে পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদেরও উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন, তার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে।...
>
> এই বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অভিমত এই সঙ্গে পাঠালাম। সকলেই জানেন, বাংলা শিক্ষা প্রচার কার্যে বিদ্যাসাগর বহুদিন থেকেই বিশেষ উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী অনেক প্রাথমিক পাঠ্যবই রচনা করে তিনি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেছেন।...
>
> বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন, আমি তা, মোটামোটি ভাবে অনুমোদন করি। ইচ্ছা, তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পরিণত করা হোক।...
>
> সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করছি, তাঁদের সকলের মত এই যে, সরকারী মডেল স্কুলে প্রথমদিকে প্রবেশ-দক্ষিণা কিছু না থাকাই উচিত। অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের মতো মডেল স্কুলগুলিও নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করতে পারবে।...
>
> শিক্ষকদের শিক্ষণ বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনের কথা কিছু বলিনি। বর্তমান অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে সংস্কৃত কলেজই নর্মাল স্কুলের জ্ঞান অধিকার করেছে।[৯৪]
>
> হ্যালিড সাহেবের উক্ত অভিমত বিদ্যাসাগরের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবোধই ফুটে উঠেছে। এবং অভিমতটি একটু মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে যে তিনি বিদ্যাসাগরের বাংলা শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।[৯৫]

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা চিন্তার সাথে হ্যালিডে সাহেব ছোটলাট হবার আগেই পরিচিত ছিলেন। এবং Notes on Sanskrit College নামে যে শিক্ষা পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর শিক্ষা পরিষদে পাঠিয়েছিলেন— এতে হ্যালিডে সাহেব যে মন্তব্য করেছিলেন— তা' বিদ্যাসাগরকে গভীর ভাবে অনুভব ও উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি। সুতরাং বিদ্যাসাগর ও হ্যালিডে সাহেব যে বাংলা শিক্ষা সংস্কার ব্যাপারে একই মত পোষণ করবেন এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এবার হ্যালিডে তাঁর বাংলা শিক্ষা সংস্কার মিনিটে মন্তব্য করেন—

www.pathagar.com

আমি জানি মাথার উপর যদি কোনো ইউরোপীয় পরিদর্শক বা কর্তা না থাকেন তাহলে দেশীয় পরিদর্শকদের কাজকর্মের উপর খুব বেশি আস্থা রাখা যায় না। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একজন অসামান্য ব্যক্তি, এবং তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের এই মডেল স্কুলের এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল কি হয় তা, দেখবার জন্য তিনি অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব, আমি সত্যিই মনে করি একাজে তিনি সফল হবেন।[৯৬]

শিক্ষাসংসদে হ্যালিডের এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন রাম গোপাল ঘোষ, জেমস কোলাভল প্রমুখ আরো কয়েকজন সদস্য। যদিও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা—

'এই নতুন শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে কোন দিক থেকে সংশ্লিষ্ট থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। পাঠ্যবই শিক্ষক ও স্কুলের জ্ঞান নির্ধারণে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁর উপদেশ খুবই মূল্যবান হবে।'[৯৭]

কিন্তু তবু তারা কলেজ পরিদর্শকের কাজটি বিদ্যাসাগরকে দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিলো একই সাথে কলেজ অধ্যক্ষের দায়িত্ব অন্য দিকে নতুন মডেল স্কুলের পরিদর্শকের কাজ দুটোই একসাথে সম্ভব নয়।

হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন— তাই প্রতিকূল মন্তব্যকে তিনি প্রাধান্য না দিয়ে বিদ্যাসাগরের উপরই বাংলা শিক্ষা সম্প্রসারণ এর পরিদর্শকের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর পেছনে তখন দুটো প্রাথমিক বাধা ছিলো, এ বাধাগুলো হলো পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষকের অভাব। শিক্ষা সংস্কারের রিপোর্টগুলোতে এবং বন্ধুদের কাছেও বিদ্যাসাগর বার বার এ বক্তব্য রেখেছেন। বিদ্যাসাগরের এ বক্তব্য তখন সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই যথার্থ বলে গ্রহণ করেছেন। সংবাদ প্রভাকরে এ প্রসঙ্গে সেদিন লেখা হয়—

'আমাদিগের লেপ্টেনান্ট গবরর্ণর সাহেব সম্প্রতি শিক্ষা কৌন্সেলের অধ্যক্ষদিগের নিকটে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের জাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে যে যে নিয়ম প্রর্বতন করা আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহারা অবিলম্বে তাহার রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন, কারণ তিনি বেহার অঞ্চল ভ্রমণ করিবার পূর্বেই তাহা নির্দ্ধারণপূর্বক ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেন্টের সম্মতি গ্রহণ করিবেন, অতএব ইউনিভারসিটি, কলেজ ও স্কুল ও নানা স্থানের বাঙালা পাঠশালার বালকদিগের বাঙালা ভাষানুশীলন বিষয়ে কি কি নিয়ম করা কর্তব্য, শিক্ষা কৌন্সেলের বাঙালা ভাষানুশীলন বিষয়ে কি কি নিয়ম করা কর্তব্য, শিক্ষা কৌন্সেলের বিজ্ঞবর মেম্বারগণ তাহাতে আশু মনোযোগী হইবেন, এবং তাহার পরেই তাঁহাদিগের পটল তুলিতে হইবেক।[৯৮]

বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ক নিয়ম নির্দ্ধারণের পূর্বেই শিক্ষক ও পুস্তক নিরূপণ করা উচিত, উপযুক্ত শিক্ষক ও পুস্তক ব্যতীত শিক্ষার আধিক্য হইতে পারে না, অধুনা গভর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বাঙালা পুস্তক পাঠার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আমরা তাহার সমুদয়ের প্রশংসা করিতে পারি না, পুস্তকাদি পরিবর্তন করা অগ্রেই রেবরেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যাকল্পদ্রুম পুস্তক ও তদ্রূপ বলিতে হইবেক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন কেবল তাহাই বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী হইয়াছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প যে তৎপাঠে কোনরূপেই শিক্ষার আতিশয্য হইতে পারে না।

আমাদিগের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের বিরচিত চারুপাঠ দুই খণ্ড ও বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধে বিচার পুস্তক সর্ববিধায়েই উত্তম হইয়াছে, কিন্তু কি পরিতাপ। শেষোক্ত পুস্তকের অধিকাংশ কুম্ব সাহেবের পুস্তক হইতে অনুবাদিত হওয়াতে শিক্ষা কৌন্সেল তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, যাহা হইক ঐ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলিবেন তাহাই গ্রাহ্য হইবেক, তাঁহার বিশিষ্ট

www.pathagar.com

রূপ বিবেচনা করা অতি আবশ্যক হইতেছে।...আমাদিগের বিজ্ঞ সহযোগি চন্দ্রিকা সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা সমাজের অধীনস্থ কর্মচারীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্কৃত, বাঙালা ও ইংরেজিতেও তিনি বিলক্ষণ সুপণ্ডিত, কিন্তু তিনি একাকী কোন দিক রক্ষা করিবেন।

বাঙালা ভাষা শিক্ষা বিষয়ে অধুনা যে যে অনিয়ম আছে তাহার কিয়দংশ আমরা উপরে লিখিলাম...বিলাতের কর্তৃপক্ষ মহাশয়েরা জাতীয় ভাষানুশীলন নিমিত্ত যখন প্রচুরার্থ ব্যয় করণে সম্মত হইয়াছেন তখন তদ্বিষয়ক নিয়মাদি সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করা কৌন্সেলের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়াছে।

নতুন মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও বাঙালা শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

এ সময় এ দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জুলাই বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস ওড ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি ডেসপ্যাস পাঠান। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যাবস্থায় এ ডেসপ্যাস একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতীয় এডুকেশন কমিশন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এ ডেসপ্যাসের উদ্দেশ্যকে এভাবে বর্ণনা করেন—

১ ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ গঠন করা দরকার।

২ ঃ প্রেসিডেন্স টাউনগুলিতে একটি করে ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার।

৩ ঃ সকল শ্রীর স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত।

৪ ঃ বর্তমানে যে সব কলেজ ও হাইস্কুল আছে সেগুলি রক্ষা করা এবং তাদের সংখ্যা বাড়ানো আবশ্যক।

৫ ঃ নতুন—বিদ্যালয় (Middle schools) স্থাপন করা প্রয়োজন।

৬ ঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাংলা পাঠশালা ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত।

৭ ঃ স্কুল কলেজকে প্রয়োজন মতো সরকারী 'গ্রান্ট' দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।[৮৩]

ইতোমধ্যে শিক্ষা সংসদের পরিবর্তে জনশিক্ষা পরিচালনা বিভাগের সৃষ্টি হয়। এবং বাংলা শিক্ষা সংসদের সভাপতি চার্লস ক্যামেরন ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে একটি আবেদন পত্র পাঠান। আবেদনপত্রে তিনি বলেন—

শিক্ষা সংসদের সভাপতিরূপে ভারতীয় যুবকদের ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কতখানি আছে, তা জানবার আমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ভাল শিক্ষা পেয়েছে তারা কোম্পানীর সিভিল ও মেডিকেল সার্ভিসের, অথবা অন্যান্য বিদ্যাবৃত্তির কতখানি উপযুক্ত তাও আমি বিশেষ ভাবে জানি। ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান পথে অন্তরায়ও আছে অনেক। তার প্রধান কারণগুলি এই—

১ ঃ প্রথম কারণ ব্রিটিশ-ভারতে ইউরোপের মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই যা শিক্ষার জন্য 'ডিগ্রি' দিতে পারে।

২ ঃ দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় যুবকদের যারা ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষা নেন তারা কোম্পানীর কোনো কনভনটেন্ড সার্ভিসে নিযুক্ত নন। সেই জন্য তারা বিদ্বান ও প্রতিভাবান হলেও, ছাত্রদের কাছে তাদের সেরকম সামাজিক মর্যাদা নেই।

৩ ঃ তৃতীয় কারণ ভারতীয় যুবকদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ইংল্যান্ডে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। এই কারণে আমার নিবেদন এই যে,—

(ক) ব্রিটিশ ভারতে একটি বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক।

(খ) সিভিল ও মেডিকেল সার্ভিসের মতো শিক্ষা বিভাগেরও কনভনন্টেড সার্ভিসের প্রবর্তন করা হোক।

www.pathagar.com

(গ) ইংল্যাণ্ডে এমন দু'একটি প্রতিষ্ঠান গড়া হোক যেখানে, এদেশের যুবকরা কন্‌ভনটেন্ড সার্ভিসের উপযুক্ত হবার মতো শিক্ষা পেতে পারে।

ক্যামেরন এর আবেদনপত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে এ'তে প্রকৃত শিক্ষা ও মননচর্চা এবং দেশ ও দেশের মাটিকে গভীরভাবে ভালোবাসার কোনো আভাস নেই। এখানে আছে ডিগ্রী লাভ করা, আর অর্থ উপার্জন ও বিত্তবান হওয়া। অর্থাৎ ক্যামেরন প্রস্তাবিত বিদ্যালয়গুলো ডিগ্রী ও অর্থ উপার্জনের কল— আর ডিগ্রীধারীরাও কেউ মানুষ নয়— তারা টাকা উপার্জনের এক একটি যন্ত্র বিশেষ হয়ে কল থেকে বের হয়। এখানে হৃদয় ও মনুষ্যত্বের বিকাশ নয়— অন্যান্য অর্থকরী পণ্যের মতো মানুষও হয় এক একটি অর্থকরী পণ্য। আর বিদ্যালয়গুলো হলো মানুষ-পণ্য উৎপাদনের কলমাত্র।

সাত

পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পেলাম যে, চার্লস ওডের ড্যাসপাচে ক্যামেরন এর শিক্ষা নীতিরই জয় হলো। বাংলা ভাষা অবহেলিত ও উপেক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হলো ইংরেজি।

ইংরেজি শিক্ষার এভাবে প্রাধান্য ও বাংলাকে এমনি করে অনাদৃত ও অবহেলার জন্য এবং বাংলার প্রতি সরকারের উদাসীনতার প্রতি বিরূপ মানসিকতা নিয়ে হ্যালিডে সাহেব লিখেন—

> There is an opinion also that education has not been extended sufficiently in the way of vernacular teaching, and in that respect I see room for improvemnt.[৮৪]

ইংরেজি অর্থ উপার্জনের ভাষা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টোর বক্তব্যেও আমরা এ সুরই প্রতিধ্বনিত হতে শুনি—

> "It is common remark that science and literature are in a Progressive state of decay among the Natives of India. From every inquiry which I have been enabled to make on this interesting subject, that remark appears to me but to well founded. The number of the learned is not only diminishe, but the circle of learning even amongst those who still devote themselves to it, appears to be considerably contracted, The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected, and branch of learning doctrines of people. The immediate consequence of this state of things is the disuse and even actual loss of many books and it is to be aprehended, that an less Government interpose with a fostering hand, the revival of letters may shortly become hopeless from want of books or of persons capable of explaining them"[৮৫]

অর্থাৎ ভারতবর্ষে আমাদের প্রজাদের যে দিন দিন বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞানে অবনতি ঘটছে, তা আমি সকলের মুখেই শুনতে পাই। বহু অনুসন্ধানের পর আমি সত্যিই বুঝতে পারলাম যে, এ ধরনের মন্তব্যের যথেষ্ট কারণ আছে। বিদ্বান ও পণ্ডিত জনের সংখ্যা যে শুধু হ্রাস পাচ্ছে তা' নয়, প্রকৃত বিদ্যাচর্চা হচ্ছে না—যাঁরা বিদ্যাচর্চা করেছেন তাঁদের বিদ্যার ক্ষেত্রেও দিনদিন অতীব সংকীর্ণ হচ্ছে। মনোবিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা মোটেই হচ্ছে না, মননচর্চাজনিত শিল্প-সাহিত্যের কোনো আদর নেই, জনসাধারণের বিশেষ বিশেষ ধর্ম বিশ্বাস সম্বলিত গ্রন্থ ও ধর্ম সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ মোটেই অধীত হয় বলে নজীর নেই। এ ধরনের অবহেলা ও অনীহার ফলে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর অধীত হয় না,

www.pathagar.com

ফলে ভালো ভালো জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থ লোপ পেতে বসেছে। এবং আমার এরূপ প্রত্যয় জন্মেছে যে, এ ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ না করলে অচিরেই ভালো পাঠ্য গ্রন্থ ও যোগ্য অধ্যাপকের অভাবে সৃজনশীল বিদ্যার পুনরুদ্ধার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।'

এরপর অবশ্য আমাদের দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শনের প্লাবন আসে। এ প্লাবনে আমরা দেশ, মাটি ও মানুষ এমনকি মাতৃভাষাকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেছি। সাহেব হওয়া আর অর্থ উপার্জনই যেখানে ইংরেজি শিক্ষার মূল কারণ— সেখানে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে আত্মস্থ করে— বিজ্ঞান সাহিত্য ও দর্শনের ভাব সম্পদকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করে, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী করে তোলার কোনো প্রশ্নই আসে না। বরং প্রথমদিকে তাদের কাছে মাতৃভাষা ছিলো অবহেলিত। আমরা আগেই আলোচনা করেছি— লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রিঃ ৭ মার্চ তার মিনিটে' লিখেছিলেন—

> ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারই বৃটিশ রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এবং শিক্ষাবাবদ সমস্ত অর্থ কেবল ইংরেজি শিক্ষার জন্যই ব্যয় করলে ভালো হয়।[৮৬]

বেন্টিঙ্কের এ উক্তির ফলে বাংলা শিক্ষা প্রসার ও মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কৃষ্ণ যবনিকা নেমে আসে। বেন্টিঙ্কের এ উক্তির ফলে ইংরেজি শিক্ষা, প্রাচ্য শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিয়েও বিতর্কের ঝড় উঠে, ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে যারা তাদের বক্তব্য হলো— আমাদের সমাজে আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলিত এবং সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ দেখলেই বুঝা যায়, সেই শিক্ষার ফল কি হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে পশ্চিমের দেশগুলোর যে কতো দ্রুত উন্নতি হয়েছে তা'ও পরিষ্কার বুঝা যায়। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমের সঙ্গে। ভারতের উন্নতি ও প্রগতি সেই কারণেই ইংরেজি ভাষার চর্চার উপর নির্ভরশীল।

> 'আর্বি ও সংস্কৃত শিক্ষার উপর যাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা সেকালের অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের স্থায়িত্ব কামনা করেন। প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের আর্বি ও সংস্কৃত ভাষায় কোরাণ, বেদ ও অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাঁরা সেই শিক্ষা পেয়ে জবরদস্ত মৌলবী ও গাঁড়া পণ্ডিত তৈরি হন। নবযুগের সমাজে এই ধরণের গাঁড়া পণ্ডিতদের সামাজিক ভূমিকা প্রগতিশীল না হবারই কথা। নতুন জ্ঞান বিদ্যার প্রতি সাধারণত তাঁরা বিমুখ। ব্রিটিশ সরকার এতদিন এই ধরণের পণ্ডিত শ্রেণী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের পণ্ডিত ও মুনশীর পদে নিযুক্ত ক'রে ও অন্যান্য সরকারী চাকরি দিয়ে তাঁরা এই বিদ্যাচর্চাকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করেছেন। আর্বি ও সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থাদি ছেপে তাঁরা যে কি প্রচুর অর্থ অপব্যয় করেছেন তার হিসেব নেই। এই সমস্ত প্রচেষ্টাই পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ও গতানুগতিক চিন্তাধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য করা হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য যদি তার সামান্য অংশও সরকার ব্যয় করতেন, তাহলে দেশের ও দশের অনেক বেশি কল্যাণ হতো। প্রাচ্যবিদ্যাকে এইভাবে উৎসাহিত ক'রে ব্রিটিশ সরকার কুসংস্কারের সমর্থক একদল দুর্ধর্ষ সৈনিক তৈরি করেছেন মাত্র।'[৮৭]

যারা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থন করেছেন তাঁদের পক্ষে অনেক যুক্তি ও বক্তব্য ছিলো— । এদের দলে আমরা উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতদেরও পাই। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সমর্থনে পণ্ডিত উইলসনের বক্তব্য—'কলকাতা শহরের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে খুব বড়ো একটা অংশের ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তারা অনেকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে এবং পুরস্কার হিসেবে ভালো চাকরিও পেয়েছে। কলকাতার বাইরে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ ও প্রেরণা বিশেষ কিছু ছিল না বলা চলে। ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক কোনো পরিকল্পনা এই জন্যই করা সম্ভব হয়নি, এবং করলেও তা সফল হতো কিনা বলা যায় না।

www.pathagar.com

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা উচিত, জাতীয় সাহিত্য কেবল জাতীয় ভাষার ভিত্তির উপরই গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞানবিদ্যারচর্চা যদি কেবল বিদেশী ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে সেই সমাজের একদল মুষ্টিমেয় লোক যাঁদের অর্থ ও অবসর দুই-ই আছে, তাঁদেরই বিলাসের বিষয় হয়ে উঠে। একথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার মৌলিক পার্থক্য এত বেশি যে ইংরেজী কখনই এ দেশের শিক্ষার প্রধান বাহন হতে পারে না। ইংরেজী চর্চা বিশেষভাবে করা হলেও তা কেবল এ দেশের সংকীর্ণ শ্রেণীগত সাহিত্যের বিকাশে সাহায্য করবে, কোনোদিনই জন সাহিত্যের ভিত্ গড়ে তুলবে না।[৮৮]

বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগর যেমন যুগের উত্তাপকে ধারণ করে কাজে লাগিয়েছেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, বাংলা শিক্ষা প্রচলন ও শিক্ষা পরিকল্পনায়ও তিনি যুগের উত্তাপকে গভীরভাবে ধারণ করে কাজে লাগিয়েছিলেন। তবে বিদ্যাসাগরের আরো একটি বড়ো কৃতিত্ব যে, তিনি শিক্ষিত বাঙালিকে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আকৃষ্ট করে শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়েছিলেন! মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও শিক্ষা পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর নিজের বক্তব্য কি গুরুত্বপূর্ণ!

> 'প্রচলিত শিক্ষাবিধির কার্যকারিতা নিয়ে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করেছি। সংস্কৃত এবং ইংরেজী বিদ্যার একই সঙ্গে গভীর জ্ঞান লাভের পরিকল্পনার উপর অনেক ভেবে-চিন্তেই আমি আমার অভিমত প্রদান করছি। আমরা ধারণা, এই রকম শিক্ষাই আমাদের স্বদেশী ভাষাগুলোকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার রসে অভিসিঞ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত মানুষ গড়ে তুলবে।[৮৯]

এ বিদ্যাসাগরের কোনো তাত্ত্বিক অভিমত নয়— বাস্তব অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানস মিলন। চেয়েছিলেন শিক্ষার বীজকে দেশ, দেশের মাটি ও মানুষের মর্মমূলে প্রোথিত করতে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে বিদ্যাসাগর একটি মানবমুখী চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক মানবমুখী চেতনাই ছিলো তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার মৌল উদ্দেশ্য। আজ শিক্ষার এ চরম সংকট কালে আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি বিদ্যাসাগর শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মনুষ্যত্বের বিকাশ চেয়েছিলেন সেটুকুই নেই। ফলে অনেক বড়ো বড়ো শ্রেণী পাশ করেও ছাত্ররা মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও মনুষ্যত্বের কিছুই বুঝে না। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য একান্ত ভাবেই সার্থক—

> 'প্রকৃত পক্ষে নব্য শিক্ষা রীতির স্রষ্টা বিদ্যাসাগর; রামমোহন, ডেভিড হেয়ার বা অপর কেহ নহেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষিত সমাজকে ইয়ং বেঙ্গল বলা হইয়া থাকে, বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে শিক্ষিত সমাজকে মডর্ণম্যান বলা অন্যায় হইবে না। বিংশ শতক বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে শিক্ষিত সমাজের উত্তরপুরুষ বিদ্যাসাগরকে তাহার আত্মীয় মনে না হওয়া অসম্ভব।
>
> বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম এবং দৃষ্টি ও পরিকল্পনা ছিলো চিরায়ত। এ জন্যই তা' বর্তমানকে যেমন প্রভাবিত করছে— অনাগত কালকেও প্রভাবিত করবে। কারণ উনিশ শতকের মানুষ হলেও বিদ্যাসাগর ছিলেন চিরকালের আধুনিক। বর্তমান যুগচেতনার আলোকে বিচার করলে দেখি এ যুগেও তিনি আধুনিককোত্তম, একশো বছর আগেই তিনি যে মানসিকতায় সহজে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আজও আমরা তার থেকে বহু পশ্চাতে পড়ে আছি। তাই বুঝতে পারি তিনি কেবল ভবিষ্যত যাত্রা পথের চিরন্তন পথিকই নন, অভ্রান্ত পথপ্রদর্শকও।'[৯৩]

www.pathagar.com

আট

পূর্বে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনা ও তাঁর Notes on sanskrit college নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা' মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো। আধুনিক বিশ্বচৈতন্যকে ধারণ করার জন্য ইংরেজি থেকে ভাব-সম্পদ আর সংস্কৃত থেকে শব্দসম্ভার নিয়ে মাতৃভাষাকে ঐশ্বর্যশালী ও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা' বাঙালিকে চিরকাল আলো দেখিয়েছে এবং মধুসূদনের কণ্ঠেও আমরা এ প্রতিধ্বনিই শুনি—

> Afterall, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. If there be anyone among us anxious to leave name and behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother tongue, That is his legilimate sphere his proper element. European scholarship is good in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe: but when we speak of world, let us speak in our own language...I should scorn the pretensions of that man to be called 'educated' who is not master of his own language.[৯১]

ইউরোপ প্রবাসকালে মধুসূধন গৌরদাসকে এ চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি এক একটি সমৃদ্ধশালী ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা লাভ করছেন আর সে ভাষা ঐশ্বর্য ও ভাব সম্পদ দিয়ে মাতৃভাষাকেও ঋদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর এ মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে নিচের চিঠিতে—

> Should I like to return. I hope to familianize my educated friends with these language through the medium of our own toungue.

এ সংকল্পের বাস্তবায়নে বাংলা ভাষা যে একান্তভাবেই উপযুক্ত এতেও তাঁর সংশয় ছিলো না—

> Believe me my dear fellow. Our Bangali is a very beautiful language. It only wants men of genious to polish it up. Such of as. Oweing to early defective education, know little of it and have learnt despise it. are miserably wrong.[৯২]

ইউরোপ প্রবাসকালে মধুসূদন 'বঙ্গভাষা' নামক যে সনেটটি রচনা করেন এতে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালাবাসাই প্রকাশ পেয়েছে—

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষনে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় নিরাহারে সপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;—
ফেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল কানন।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?

www.pathagar.com

যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞাসুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মনি জালে ॥

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা বঙ্কিম মানসকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো— তিনি বুঝেছিলেন যে, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেই এ দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা সৃজনশীল না হয়ে এক চরম অন্ধকারে আত্মাহুতি দিচ্ছে। তাই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব তুলে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক অধিবেশনে বলেছিলেন 'ইংরেজীর যাতাকলে অসংখ্য বালক পিষ্ট হচ্ছে ও মনুষ্যত্বকে হারাচ্ছে'।

তাঁর লোক রহস্য গ্রন্থের 'গর্দ্দভ' প্রবন্ধে তিনি আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

> হে রজকগৃহ ভূষণ। কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপন পূর্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতী মণ্ডপমধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দ্দভ লোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দ্দভ লোকে প্রবেশ করিলে, 'প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল' বলিয়া মহাগর্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।[৯৩]

বঙ্কিম ইংরেজের ডিপুটি ছিলেন। কাজেই চাকুরি রক্ষার খাতিরে অনেক কথাই তিনি আকারে ইঙ্গিতে বলেছেন। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা—

> লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাট লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্বারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালার লোকশিক্ষা নাই। যাঁরারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।
>
> ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজি-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন।[৯৪]

লোকশিক্ষার রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বঙ্কিম বলেছেন—

> ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না।
>
> এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপত্র; কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহস্র সহস্র। এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহস্র, লক্ষ

www.pathagar.com

লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোকে সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্ব্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে; আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।[৯৫]

মাতৃভাষায় লোকশিক্ষার মাধ্যমে যে, দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা যায় বঙ্কিম এর উপর দৃঢ় আস্থা রেখে বলেন—

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমুর দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন— লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কলেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্ নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তূলা পেঁজে, যে কাট্‌না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত-শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য— সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুল্‌কি কাওরাণী শূয়ার চরাইতে অপারাগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে! তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ

www.pathagar.com

শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রান্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথাকতা লোপ পাইল। ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।[৯৬]

'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে বঙ্কিম আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার পাচ্ছে কিন্তু দিন দিন লোকশিক্ষার অভাবে শিক্ষার হারও কমছে—

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্‌কারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব্, এ দেশে সার অস্‌লি ইডেন, ইহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী— সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজ ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে-বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝালেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গলায় সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমবেদনা চাই।[৯৭]

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে বঙ্কিম বলেছেন যে, এই শিক্ষায় জ্ঞানার্জন সম্ভব কিন্তু এতে মানসিক বিকাশ ঘটেনা—। বঙ্কিম এ শিক্ষাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন ও ভারসাম্যহীন শিক্ষা বলেছেন—

'এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ভারসাম্যহীন জ্ঞান চর্চার ফলে এদেশে বাঙালীরা অমানুষ হইতেছে। তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক— ইহাই বাঙালীর চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্প কুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্যকারিণীবৃত্তি, মনোরঞ্জিনীবৃত্তি, যতগুলি আছে সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য যোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্তি মঙ্গলদায়ক নহে।...অনুশীলন নীতির মূল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে; কেহ কাহাকেও ক্ষুণ্ন করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।'[৯৮]

এই শিক্ষায় যে একজন মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না বঙ্কিম তা'ও বলেছেন—

'আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক কি বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কি? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞান-কুশলী কিন্তু কাব্য রসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ অথবা যে সৌন্দর্যদত্ত প্রাণ, সর্ব সৌন্দর্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ, সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই

www.pathagar.com

মনুষ্যত্বহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিশারদ কিন্তু রাজধর্মে অনভিজ্ঞ অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্মে অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দু ধর্মের মর্ম।'[৯৯]

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অধোগামীর কথা আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন—

'এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেসন্ ফিলটার ডৌন করিবে। কথার তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলে অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার উপরিভাগে জলসেচ করিলেই, নিম্নস্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল বাঙালীজাতি রূপ শোষক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা সরস হইয়াছে বটে। ইংরাজী শিক্ষার সহিত এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতে ছিল; এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা, তাহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা কারি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্যা হইলে তাহাদিগের সংসর্গ গুণে অন্যাংশের শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষায় এরূপ ভেদ থাকে যে বিদ্যানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?[১০০]

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. এই পবিত্র বাণী দিয়েই ঐশীগ্রন্থ কোরান নাজেল শুরু হয়।

২. বৃহাদারণ্যক উপনিষদ, ১—৩, পৃ. ২৮ হরফ প্রকাশনী, ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী—১২ (বিশ্বভারতী), পৃ. ২৭৫

৪. মেকলের মিনিট, ২ ফেব্রুয়ারি. ১৮৩৫

৫. এই কৃত্রিম শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—
আমরা যে সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয়না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া উলকি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলিতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভ ভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলো সস্তা বিলাতি কাঁচ খণ্ড পুতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতি সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারেনা কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলো সস্তা চকচকে বিলাতি কথা লইয়া ঝলমল করিয়া বেড়াই এবং বিলাতি বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসংগত প্রয়োগ করি, আমরা নিজেও বুঝিতে পারিনা অজ্ঞাতসারে কি একটা অপূর্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।...আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের শিকড় যেখানে, সেখানে হইতে শত হস্তদূরে আমাদের শিক্ষা বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে। বাধা ভেদ-করিয়া যেটুকু রস আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনে শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানীগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ীয় উপযোগী করে মাত্র। (রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮৪—৮৫)

৬. আশ্রমে যাহারা বাস করিতেন, তাহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাহাদের সেবা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন।...চতুষ্পাঠিতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সবচেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারিদিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ওই পড়া লইয়া আছেন; শুধু তাই নয়, সেখানে জীবন যাত্রা নিতান্ত সাধাসিধে; বৈষয়িকতা, বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারেনা, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিল খাইবার সময় ও সুবিধা পায় (রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী—১২, পৃ. ৩০০)

৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃ. ৩৪—৩৫

৮. A.F. Salauddin Ahmed. Social ideas and social change in Bengal. 1818-1835

৯. A. Howell, Education in India, P-75

১০. Sayed Nurrallha & J.P. Naik. A Studies History of Education in India (1800—1947). P. 54

১১. ঐ

১২. R.G. Wilder. Mission Schools in India. P. 36-37

১৩. J.A. Richter. A History of Mission in India. P. 149

www.pathagar.com

১৪. Nurrullaha & Naik. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
১৫. ঐ পৃ. ৩৭
১৬. ঐ, পৃ. ৪৩
১৭. Sayed Mahmood. History of English Education in India, P. 11
১৮. ঐ পৃ. ৪১
১৯. ঐ, পৃ. ৪২
২০. ঐ, পৃ. ৪৪
২১. ঐ, পৃ. ৪৫
২২. ঐ, পৃ. ৪৬
২৩. Nurrullha & Naik, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
২৪. ঐ, পৃ. ৪৮
২৫. ঐ, পৃ. ৪৫
২৬. ঐ, পৃ. ৪৭
২৭. J.A. Richter. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
২৮. W.H. Sharp. পৃ. ৪৭
২৯. M.A. Sherring. The History of Protestent Missions in India P. 75
৩০. সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২৭
৩১. গভর্ণর স্যার জনশোর Notes on Indian Affair P.39
৩২. H.A. Stark. Varnacular Education in Bengal. Calcutta. 1916. P. 45
৩৩. পূর্বেক্ত, পৃ. ৫০
৩৪. পূর্বেক্ত, পৃ. ৭৬
৩৫. Charls. E. Travelyan. on the Education of the People of India London. 1838
৩৬. Literature of Bengal. R.C. Datta. P. 96
৩৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৭৪
৩৮. John Bull. 18th January-1831
৩৯. H.H. Willson's. Report on Education of 1828
৪০. ঐ
৪১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৯৮-৯৯
৪২. Recollection of Alexander duff. লাল বিহারী দে, পৃ. ৫৭
৪৩. (ক) ঐ
৪৪. Calcutta Govt Gazette. 25th January. 1828
৪৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, রাকতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৯৫-৯৬
৪৬. Calcutta Gazette, 24th January. 1828
৪৭. বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, পৃ. ৫৫-৫৬
৪৮. গোপল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০
৪৯. লালবিহারী দে, Recollection of Alexander duff. পৃ. ৩৭
৫০. নগেন্দ্রনাথ সোম, রাজা রামমোহন রায়ের জীবন, পৃ. ৩৪০
৫১. সুধাকর, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩
৫২. H.A. Stark. Varnacular Education in Bengal. Calcutta. 1916. P. 47
৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

www.pathagar.com

৫৪. Chales. E. Travelyan. on the Eduction of the people of india. p. 90
৫৫. মেকলের মিনিট, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫
৫৬. মেকলের মিনিট, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫
এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর মেকলের কি তাচ্ছিল্যকর মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁর উক্তিই প্রকাশ পায়। আমি তাঁর উক্তির আরো কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি—
"I have no knowledge of either sanskrit or Arabic. But I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European Library was worth the whole native literature of India and Arabia.....I certainly never met with any orientalist who venturd to maintain that the Arabic and Sanskrit poetry could be compared to that of the European nations. And when we pass from works of imagination to works in which facts are recorded and general principles investigated, the superiority of the Europeans becomes absolutely immeasurable...The oriental language is barien of useful knowledge and full of monstrous superstions. Are we to teach false history, false astronomy, false medicine, because we found it in Company with a false Philosophy?"
A source book of Modern Education (pp 14-29) compleied by M.R. Paranipe. 1938
৫৭. Macculay's Minute on Education. 1835 in the Report of Saler's commission of the University of Calcutta, 1917 Vol-vi. p. 14 (A ppendix 11).
৫৮. ঐ, পৃ. ৩৫
৫৯. ঐ, পৃ. ৪৩
৬০. কোলকাতা রিভিউ, পৃ. ৩০৫, ১৬.৬.১৮৫৪
৬১. Charles Travelyan. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬
৬২. H.A. Stark. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
৬৩. ঐ
৬৪. General Dept. Home Miscellaneous. no 5/4 vol no 17
৬৫. Notes on Sansckrit College. পূর্বোক্ত
৬৬. Travelyan on The Education of the people of India. P-52
৬৭. ঐ
৬৮. Notes on Sansckrit College.
৬৯. নগেন্দ্রনাথ সোম, মধু স্মৃতি, পৃ. ৮২—৮৩
৭০. বিদ্যাসাগরের চিঠি পত্র, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১২
৭১. ছোটলাট হ্যালিডের মন্তব্য, বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১৭৬
৭২. বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র, বিদ্যাসাগর রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২২
৭৩. ঐ, পৃ. ৪২৬
৭৪. ঐ, পৃ. ৪২৮
৭৫. ঐ, পৃ. ৪৩০
৭৬. বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, পৃ. ১০৫
৭৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৮৭
৭৮. সফিউদ্দিন আহমদ, মানুষ ও শিল্পী বিদ্যাসাগর, পৃ. ৩২১

www.pathagar.com

৭৯. বিদ্যাসাগরের চিঠি, বিদ্যাসাগর রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫
৮০. ঐ, ৪৫০
৮১. General Department. Home Micellanous. no 5/4. vol no. 17
৮২. সংবাদ প্রভাকর,
৮৩. বিদ্যাসাগরের চিঠি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩
৮৪. General Dpt. Home Miscellanous on 5/4 vol no. 17
৮৫. লর্ড মিন্টোর মিনিট, ১৮১১
৮৬. লর্ড বেন্টিঙ্কের মিনিট ১৯৩৫
৮৭. ঐ
৮৮. উইলসনের বক্তব্য হিন্দু কলেজের নথিপত্র হতে উদ্ধৃত
৮৯. বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনা,
৯০. প্রমথনাথ বিশী, ভূমিকা, বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, পৃ. ২৫৫
৯১. ইউরোপ প্রবাসকালে ভার্সাই নগরী থেকে মধুসূদন তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে এই চিঠি লিখেন ২৬ জানুয়ারি, ১৮৬৫
৯২. ঐ
৯৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গর্দভ, লোক রহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা
৯৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লোক শিক্ষা, ঐ, পৃ. ৩৭৬
৯৫. ঐ, পৃ. ৩৭৬
৯৬. ঐ, পৃ. ৩৭৭
৯৭. ঐ, পৃ. ৩৭৭
৯৮. বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৩
৯৯. ঐ, পৃ. ৬১৪
১০০. ঐ, পৃ. ৬১৫

www.pathagar.com

শিক্ষানীতির রূপরেখা : দ্বিতীয় পর্ব

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, রবীন্দ্রনাথ মহাকবি—কিন্তু স্মরণীয় যে, তিনি শুধু একজন বিশ্ব কবি বা একজন মহাকবিই নন, তিনি একজন শিক্ষক, একজন মহোত্তম শিক্ষক এবং তিনি গুরুদেব। আরো বিস্ময়, সমগ্র পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথই একটি বিরল দৃষ্টান্ত যে, তিনি শুধু কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমেই সমগ্র জাতির মর্মমূলে আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও মনন জাগরণের আলোক সম্পাত করেননি, তিনি নিজে একটি বিদ্যালয় এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়[১] স্থাপন করে জাতির শিক্ষাদানের কার্যভারও নিজের হাতেই গ্রহণ করেছিলেন।

শৈশব ও বাল্যজীবনের শিক্ষার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন বহু লেখায়। স্কুলে যাওয়াকে তিনি বলেছেন 'দীপান্তর বাস ও কারাবাস'।[২] নিজেকে তিনি বলেছেন স্কুল পালানো ছেলে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় নিজেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়। কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন মানুষকে আনন্দ রসধারা পান করিয়েছেন, তেমনি শিক্ষাবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথও শিক্ষার্থীর জন্য নিজস্ব শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে শিক্ষার্থীকে আনন্দ-বিধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজস্ব শিক্ষা রীতিতে দেখিয়েছেন যে, স্কুল থেকে শিক্ষার্থী পালাবে না বরং ঘর ছেড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে তারা স্কুলে আসবে মানসিক মুক্তির জন্য—আনন্দের জন্য। তিনি বলেছেন—

> 'শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে এক সুরে, সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না'।[৩]
>
> শিক্ষার্থীদের তিনি সোনার খাঁচায় মরাপাখি বানাতে চাননি[৩(ক)] তাই তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রকৃতির স্নেহছায়ায়, উন্মুক্ত ডালে ফুল, পাখির গান আর মুক্ত বাতাসের প্রশান্তি। বিদ্যাকে তিনি পুঁথির গণ্ডি থেকে নিয়ে এলেন আনন্দের রস-ধারার উচ্ছ্বাসে। তাই ঋতু বৈচিত্রের সাথে সাথে পাঠেরও পবিরর্তন করেছেন। গতবাঁধা মুখস্থ বিদ্যার যন্ত্রণা থেকে শিশুকে গানে, নাটকে, আবৃতিতে, উৎসবে আনন্দে তিনি শিক্ষার্থীকে মাতিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন বিদ্যাচর্চার অপর নাম হচ্ছে জীবনচর্চা। পুঁথিপড়া পণ্ডিত তিনি চাননি—চেয়েছেন মনে-প্রাণে বিকাশ মুক্ত নির্ভেজাল মানুষ। শিক্ষার আনন্দলোকে আর মঙ্গল আলোকে অভিস্নাত মানুষ।

বিশ্ব মৈত্রী আর বিশ্ব শান্তিকে তিনি শিক্ষার পরম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তির বাণী নিয়ে পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপক লিখেন—

> পশ্চিম ভূ-ভাগ কামান বন্দুকের আয়োজন করুক—যেই শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা।—ভারতে একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণরূপে মুছে যাক—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটি মাত্র দেশ আছে সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটি মাত্র নেশন আছে সে হচ্ছে মানুষ! আমাদের শান্তিনিকেতনের উদয়গিরির কাছে, সেখানে আমি অস্তগিরির লোকদের নিমন্ত্রণ করেছি। তাদের বরণ করে নেবার জন্যে তোরা তোদের ঘরকে প্রশস্ত কর—হৃদয়কে উন্মুক্ত কর—

www.pathagar.com

শান্তিনিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আঁধির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে।[৪]

১৯১৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেন—

'শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে। ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের জন্যে বিশ্বজাতিকে মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলবো এই আমার মনে আছে; সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।'[৫]

বিদ্যা আর শিক্ষা এ দু'টোকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখেছেন। তাঁর শান্তিনিকেতন ও বিশ্ব ভারতীতে বিদ্যাদানের কথা কমই বলেছেন অথচ সারাজীবনই তিনি বলেছেন শিক্ষার কথা। বিদ্যা অর্জন করা সহজ কিন্তু শিক্ষিত হওয়া সহজ নয়। 'বিদ্যা আহরণের বস্তু, শিক্ষা আচরণের। এজন্যই বলা যায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেই ধর্ম সম্বন্ধে জানা যায় কিন্তু ধার্মিক হওয়া যায় না। তেমনি বিদ্যা লাভ করলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না। অধিত বিদ্যার সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ না ঘটলে বিদ্বান ব্যক্তিকেও মূলত অশিক্ষিত বলা যায়। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির যথার্থ পরিচয় তার কর্মে, আচরণে, চিন্তা চেতনা ও রুচিতে এবং মুখের বাক্যে।

সারা জীবন রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষা ও শিক্ষানীতি নিয়ে ভেবেছেন এবং চিন্তা করেছেন। পৃথিবীর অনেক শিক্ষাবিদই দেশের শিক্ষা, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করেছেন। কিন্তু হাতে কলমে কাজ না করে তারা শুধুমাত্র দূর থেকে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথই শিক্ষা নিয়ে হাতে কলমে কাজ করেছেন।

দেশকে জাতিকে গড়ে তোলাই সকল শিক্ষার মূলগত উদ্দেশ্য। মনকে গড়ে তোলবার জন্যে খানিকটা পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন হবেই। মনীষী ব্যক্তিদের মনীষা এবং মহৎ চিন্তার সঙ্গে পরিচয় মানসিক উৎকর্ষের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু কেবলমাত্র পুঁথির জগতে আবদ্ধ থাকলে মনের শৌখিন বৃত্তি ঘোচে না, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চারপাশের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে তবে মনে সজীবতা আসবে, বলিষ্ঠতা আসবে। যেখানে চাষী চাষ করছে, তাঁতি তাঁত বুনছে, কুলু ঘানি ঘোরাচ্ছে, কুমোর হাঁড়ি-কলসি গড়ছে, কামার কোদাল-কুড়ল তৈরি করছে—সেই জীবনের সঙ্গে পরিচয় চাই, তবে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। দেশের মাটির সঙ্গে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় না হলে শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য দেশকে গড়ে তোলা, তা কিছুতেই সফল হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারীতি আলোচনা করবার সময় একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। পৃথিবীর খুব কম শিক্ষাবিদই হাতেকলমে শিক্ষাদানের কাজ করেছেন। বেশির ভাগ শিক্ষাবিদই দূর থেকে কতকগুলি মূলনীতি নির্দেশ করেছেন। সেগুলি খুবই মূল্যবান জিনিস, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার ইমারত গড়তে বসেছিলেন এর ভিত্ থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপ তিনি নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন, প্রয়োজনবোধে গড়া জিনিস ভেঙ্গেছেন, আবার গড়েছেন, অদল-বদল করেছেন। শিক্ষাপ্রণালীর অপূর্ণতা যখন যেমন চোখে পড়েছে তেমনিভাবে তার পরিবর্তন সাধন করেছেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। যে মানুষকে জানবার জন্যে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য দর্শন অধ্যয়নের আয়োজন সেই মানুষকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হবে, তার অভাব-অভিযোগের কথা ভাবতে হবে। তার বাসের অযোগ্য গৃহকে বাসযোগ্য, তার ভাগ্যহীন জীবনকে উপভোগ্য করবার ভার শিক্ষিতেরা যদি গ্রহণ না করেন, তবে দেশের শ্রীহীন মলিন মূর্তি কখনো ঘুচবে না। এই জন্য শান্তিনিকেতনের বিদ্যার্থীদের চোখের সমুখে তিনি শ্রীনিকেতনের

www.pathagar.com

অনুশীলন কেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন। এই দিক থেকে শ্রীনিকেতনকে বলা চলে শান্তিনিকেতনের ল্যাবরেটরি-গৃহ।[৬]

এজন্যই স্যার মাইকেল স্যাডলার তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের রিপোর্টে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা পদ্ধতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলার জন্যই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি। এজন্যই তিনি বলেছেন—

> 'আমরা মানুষ বলতে যা বুঝি শিক্ষাও তদানুরূপ আদর্শে সম্পন্ন হইবে। কারণ মানুষকে মানুষ করে তোলাই শিক্ষা'।[৭]

তিনি আরো বলেছেন—

> শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কি হইব এবং কি শিখিব—এই দুটো কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যতো বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশী ধরে না।[৮]

আমাদের শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ভেবেছেন, চিন্তা করেছেন ও এর বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য ও শিল্পকর্মের একটা বিপুল অংশ জুড়ে আছে আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা।

এ বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন এমন কি প্রথম জীবনে অনেক কবিতাও লিখেছেন।[৯] মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি মাতৃভাষার সপক্ষে লিখেছেন 'ন্যাশনাল ফণ্ড'[১০] নামে এক প্রতিবাদী ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ। এছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগুলো হচ্ছে যথাক্রমে—

১. ছাত্রদেরর প্রতি সম্ভাষণ
২. শিক্ষা সংস্কার
৩. শিক্ষা সমস্যা
৪. জাতীয় বিদ্যালয়
৫. আবরণ
৬. তপোবন
৭. ধর্মশিক্ষা
৮. শিক্ষা বিধি
৯. লক্ষ্য ও চিন্তা
১০. স্ত্রীশিক্ষা
১১. শিক্ষার বাহন
১২. ছাত্র শাসনতন্ত্র
১৩. অসন্তোষের কারণ
১৪. বিদ্যার যাচাই
১৫. বিদ্যা সমবায়
১৬. শিক্ষা মিলন
১৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ
১৮. শিক্ষার বিকিরণ
১৯. শিক্ষা ও সংস্কৃতি
২০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ
২১. আশ্রমের শিক্ষা
২২. ছাত্র সম্ভাষণ
২৩. জীবনস্মৃতি
২৪. সাহিত্য সম্মিলন

www.pathagar.com

২৫. সভাপতির অভিভাষণ
২৬. ছেলেবেলা
২৭. ন্যাশনাল ফণ্ড
২৮. লাইব্রেরী
২৯. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবহেলা
৩০. শিক্ষার হেরফের
৩১. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি
৩২. সাহিত্যের গৌরব
৩৩. বাংলা জাতীয় সাহিত্য
৩৪. ভাষা বিচ্ছেদ
৩৫. অপর পক্ষের কথা
৩৬. ব্রতধারণ
৩৭. অবস্থা ও ব্যবস্থা
৩৮. ভাষার কথা
৩৯. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
৪০. বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ
৪১. বাংলা ভাষা পরিচয়
৪২. ভারতী
৪৩. রাশিয়ার চিঠি
৪৪. বিশ্ব পরিচয়
৪৫. কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন
৪৬. প্রসঙ্গ কথা
৪৭. বিজ্ঞান সভা
৪৮. অসন্তোষের কারণ
৪৯. জাভাযাত্রীর পত্র
৫০. প্রাঞ্জলতা
৫১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
৫২. ভাষার কথা
৫৩. ইংরেজী সোপান
৫৪. ইংরেজি সহজ শিক্ষা
৫৫. তোতা কাহিনী
৫৬. আকাঙ্খা

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষা মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> 'আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলিণ্য ঘোষণা করতো। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসেবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বার বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল, তারপরে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল মাস্টারের শাসন হতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাতক।—এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ

www.pathagar.com

ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারের উপকরণ যতই সামান্য থাক, শিশু মনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল দম হারিয়ে চলতে হয়নি। শেখার সঙ্গে বুঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে মানুষ হতে হয়নি'।

ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত হলো—

'ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়'।[১১]

দুই

শৈশব কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে একটি স্বাদেশিক চেতনা দানা বেঁধে উঠেছিলো। আর এ স্বাদেশিক চেতনার মূলে ছিলো মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। বাংলা ভাষার মাধ্যম সকল জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের কথাও তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন। তাঁর এ অভিপ্রায়ের মূলে ছিলো তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এজন্যই তিনি বলেন যে,—

'বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বার বার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।'[১২]

বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষা চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নতুন আত্মীয় ইংরেজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।'[১৩]

কবির আরো দু'একটি উক্তি এখানে তুলে ধরছি—

ক. বাঙালি হইয়া বাঙালিকে, পিতা ভ্রাতা-আত্মীয় স্বজনকে ইংরেজীতে পত্র লেখার যে কতো বড়ো লাঞ্ছনা তাহা আমরা অনুভব মাত্র করি না।[১৪]

খ. বাস্তবিক মাতৃভাষার প্রতি যদি সম্মানবোধ জন্মে থাকে তবে স্বদেশী আত্মীয়কে ইংরেজী লেখার মতো কুকীর্তি কেউ করতে পারে না।[১৫]

গ. ছেলে বেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল।[১৬]

ঘ. যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজী পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গত সেজ দাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।[১৭]

মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বালক রবীন্দ্রনাথ সেদিন আবেগ ভরে লিখলেন—

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়,
সে ভাষা করিবে পান।

.....

বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়
ঘুচে যায় অপমান।[১৮]

www.pathagar.com

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্বাত্মবোধ সৃষ্টি করার জন্য কবির আহ্বান—

> 'আপনার ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া গান কর। বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার কথা বলিতে দাও। মাতৃভাষায় জগতের বিচিত্র সঙ্গীতে যোগ দাও। বাঙালির সহিত মিলিয়া বিশ্বসঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।'[১৯]

সাহিত্য চর্চাই শুধু নয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মাতৃভাষার অসীম গুরুত্বের কথা চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথ সেদিন লিখেছিলেন—

> 'বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা তাহাদিগকে করিতে হইবে।'[২০]

কবি আরো বললেন—

> আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে এতকাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম, তাহাতে লাভের অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই জমিল। আর দেশী ভাষায় স্বদেশী হৃদয় দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম অমনি মুহূর্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন।[২১]

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজী জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে কয়েকজন লোক ইংরেজি ভাষাটিকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাচ্ছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাদের ভয়। হায়রে দারিদ্রের আকাঙ্খা ও দারিদ্র।[২২]

আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনায় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজি শিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেচিলেন যে দূর দেশি ভাষা থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।[২৩]

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ না হলে যে শিক্ষায় পরিপূর্ণতা আসে না রবীন্দ্রনাথ তাও বলেছেন। 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদগ্ধ, জগতে এই সর্বজন স্বীকৃত নিরতিশয় সহজকথা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যে ইংরেজি শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিলআজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশাকরি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।'[২৪]

ইংরেজী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা, ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থাও উত্তম কিন্তু বাঙালির জন্য বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাই অতীব উত্তম। অন্যথায় দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই একটা কিম্ভুতকিমারে পরিণত হবে। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য।

'দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।[২৫]

ঔপনিবেশিক সরকারের স্বার্থ আদায়ের যন্ত্র তৈরির জন্যই সেদিন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছিলো। এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

> ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষা পাশ করা ডিগ্রিধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়ো গোছের শিলমোহর। মানুষকে তৈরী নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার দর দাগিয় দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিতেছে।[২৬]

www.pathagar.com

মাতৃভাষার মাধ্যমে অধিত বিষয়কে আত্মস্থ করতে পারেনি বলে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণে করুণ ও অসহায় অবস্থা দেখে, রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেন—

> ...আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবল মজুরী করিয়া মরি; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না।...আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।...এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থ জগৎ এক প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু।...এইরূপে জীবনের এক তৃতীয়াংশকাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরদিন আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যথার্থ লাভ করিতে পারিব।
>
> আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।[২৭]

আমাদের শিক্ষানীতি, শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষা সমস্যা ও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে সেদিন রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর চারদিকে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সমর্থন করে আনন্দমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেন যে, এ সমস্ত কথা তাঁদেরই মনের কথা। তাঁদের পত্র পেয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার সাধনা পত্রিকায় (চৈত্র-১২৯৯) লিখেন—

> স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, এ কথা কে না বুঝে?...দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোন গতি নাই, এ কথা কেহ না বুঝলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।[২৮]

রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত অভিমতকে সমর্থন করে আই, সি, এস, লোকেন্দ্রনাথ পালিতও চিঠি লিখেন। প্রবন্ধটি প্রকাশের কিছুদিন পরই রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন—

> মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম। বিদেশী ভাষায় পীড়নমাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিলাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ঐ দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি বাল্যকালেই ইংরেজীর সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারুভাবে অভ্যস্ত হয় না এবং ইংরেজীতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অতএব দায়ে পড়িয়া তাহাদের পড়াশুনা কেবলমাত্র কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।[২৯]

অধিত বিদ্যাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মস্থ করতে না পারলে যে, চিন্তা শক্তি ও কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীলতা অপরিণত থেকে যায়—এসব কথা তিনি পরবর্তীকালে বলেছেন 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এবং 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে। মাতৃভাষা সম্বন্ধে এখানে তাঁর বক্তব্য—

www.pathagar.com

কোন শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সমস্ত জাতির জীবন ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন করিতে সেই জন্য পালি ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন।...আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।[৩০]

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং মাটি ও মানুষের একাত্মতায় সম্পৃক্ত করে, শিকড় সম্ভূত করে মাতৃভাষার মাধ্যমে তা' আত্মস্থ করে নিতে। 'ন্যাশনাল ফণ্ড' নামে তিনি মাতৃভাষার সপক্ষে প্রথম এক প্রতিবাদী ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেন—

কেবল ইংরাজি লিখিলে কিম্বা ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলে হয় না! ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাঙ্গলায় প্রকাশ কর। বাঙ্গালির সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।[৩১]

'আত্মশক্তি' গ্রন্থের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে তিনি আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও মাতৃভাষায় শিক্ষা সম্বন্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। এ প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য—

আমাদের বাল্যকাল এবং দেশের সাহিত্য, সাহিত্য-সমাজ ও দেশের শিক্ষিত সমাজের মাঝখানকার ব্যবধান রেখা অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তখনো ইংরেজি রচনা ও ইংরেজি বক্তৃতায় খ্যাতিলাভ করিবার আকাঙ্খা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। এমনকি যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিতেন তাহারা ইংরেজি মাচার উপর চড়িয়া তবে সেটুকু প্রশ্রয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তখনকার দিনে মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না—তখন কেহ বাংলার মিল্টন, কেহবা বাংলার বায়রণ, কেহবা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন—এমনকি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাহাকে বাংলার গ্যারিক বলিলে আমাদের আশা মিটিত।[৩২]

দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং ভাষা ও পারিপার্শ্বিক আবহে সম্পৃক্ত করে ছাত্রদের স্বাধীন শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই অভিমত প্রদান করতেন। 'কী করিলে বিদেশী চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্যকে যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি, ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশ, পরেরর জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিতেছে।'[৩৩]

মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর ও তাচ্ছিল্যের মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের মনে যে বেদনা সৃষ্টি হয়েছে এরই উত্তাপ আমরা পাই 'বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা' প্রবন্ধে—

'যাঁহারা অনেক ইংরাজি কেতাব পড়িয়াছেন তাঁহারা অনেকেই আধুনিক বাংলা লেখা ও লেখকদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বোধ করি ইতর সাধারণ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া অভিমানে তাঁহারা আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠেন। একটা কথা ভুলিয়া যান যে, পৃথিবীতে বড়ো হওয়া শক্ত, কিন্তু আপনাকে বড়ো মনে করা সকলের চেয়ে সহজ। সমযোগ্য লোককে দূরে পরিহার করিয়া অনেকে স্বকপোলকল্পিত মহত্ত্ব লাভ করে, কিন্তু প্রার্থনা করি এরূপ অজ্ঞানকৃত প্রহসন-অভিনয় হইতে আমাদের অন্তর্যামি আমাদিগকে সতত বিরত করুন।

www.pathagar.com

যাঁহারা শুধুমাত্র পরের চিন্তালব্ধ ধন সঞ্চয় করিয়া জীবনযাপন করেন তাঁহারা জানেন না নিজে কোনো বিষয় আনুপূর্বিক চিন্তা করা এবং সেই চিন্তা ভাষায় ব্যক্ত করা কি কঠিন। অনেক বড়ো বড়ো কথা পরের মুখ হইতে পরিপক্ক ফলের মতো অতি সহজে পাড়িয়া ব্যক্তি কেবলমাত্র পাঠ করিতে শিখিয়াছে, সঞ্চয় করা ছাড়া বিদ্যাকে আর কোনো প্রকার ব্যবহারে লাগায় নাই, সে নিজে ঠিক জানে না সে কতটা জানে এবং কতটা জানে না।

যাঁহারা বাংলা লেখেন তাঁহারাই বাংলা ভাষার বাস্তবিক চর্চা করেন; অগত্যাই তাঁহাদিগকে বাংলা চর্চা করিতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ শ্রদ্ধা অবশ্যই আছে। রাজভাষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা নহে, সম্মনলাভের ভাষা নহে, অর্থোপার্জনের ভাষা নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা। যাঁহাদের হৃদয়ে ইহার প্রতি একান্ত অনুরাগ ও অটল ভরসা আছে তাঁহাদেরই ভাষা। যাঁহারা উপেক্ষাভরে দূরে থাকেন তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে কোনো সুযোগই পান নাই তাঁহারা তর্জমা করিয়া বাংলার বিচার করেন। অতএব সভয়ে নিবেদন করিতেছি, এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতের অধিক মূল্য নাই।[৩৪]

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার ভিতরে উপর গড়ে উছেছিলো বলেই তিনি বাংলা ভাষার প্রাণ স্পন্দনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তা গভীরভাবে আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন। 'জীবন স্মৃতি'তে তিনি স্বীকার করেছেন যে,এজন্যই এই ভাষা তাঁর কাছে প্রাণময় ও আনন্দময় হয়েছিলো।

...ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটা চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উছে— তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে— মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটেখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাক করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে-বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহু কষ্টে অনেক দেরীতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গত সেজদাদার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।[৩৫]

এ প্রত্যয়বোধ থেকেই 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> 'বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বার বার দেশের সামনে এনেছিল তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।'[৩৬]

ভাষার ভিত্ ভালো করে গড়ে তুলতে না পারলে যে, ভাষা আয়ত্ব করা যায় না, ভাষার উপর দখল আসে না একথা তিনি বার বার বলেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি তাঁর সেজদা হেমেন্দ্র ঠাকুরের উপদেশও স্মরণ করেছেন—

> 'সেজদাদা বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নিচে, তখনও বিএডি ব্যাড, এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছায়নি।'[৩৭]

মাতৃভাষার গাঁথুনি তাঁর শক্ত ছিলো বলেই তিনি সহজে এই ভাষাকে আয়ত্ব করেছিলেন এবং মাতৃভাষার মাধুর্য ও এর অন্তরের সুর আর ভাব ব্যঞ্জনাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।

এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক, বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয়নি, শেখার সঙ্গে

www.pathagar.com

বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাথা ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মানুষ হতে হয়নি।...

ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম, তাই কচি বয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক করে তুলতে হয়নি; চলা এবং রাস্তা খোঁড়া ছিল না একসঙ্গে। নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষার রচনায় অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সমাধানে সেলাই করে করে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানো অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি, তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষার রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্বিত কোনো সুয়োরানী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখ চাপা দিয়ে রাখেনি। আমার ইংরেজি শিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ দিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিনীপনার জোরে ইংরেজির জানা ভদ্র সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; যা কিছু মাপে খাটো, তাকে কোনোরকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে। নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।[৩৮]

আসলে আমরা ভুলে যাই যে, নিজের ভাষা ভালো করে আয়ত্ব না করলে অন্য ভাষায়ও দখল আসে না। আমাদের দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা বাংলা ভাষাকে আয়ত্ব করেছেন তাদের কাছে ইংরেজী ভাষাটাও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং উভয় ভাষাতেই তাঁদের দক্ষতা ও স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন থেকেই এর দৃষ্টান্ত দিয়েছে—

> "পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখিনি, ইংরেজি যে ভালো করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর-কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি। আমি তেরো বছর পর্যন্ত ইস্কুলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় যখন আমি আমার লেখার অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন গীতাঞ্জলির গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্‌বোধন হয়েছিল বলে সেই গানগুলিই অনুবাদ করলাম। সেই তর্জমার বই আমার পশ্চিম মহাদেশ যাত্রার যথার্থ পাথেয়স্বরূপ হল। দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।"[৩৯]

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি ১২৯৯ সালে 'সাধনা' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব কতোটুকু রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে তা বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি রাজশাহী' অ্যাসোসিয়েশনে' পঠিত হয়। পরে তা 'শিক্ষা' গ্রন্থ ও রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়।

আমাদের কোমলমতি শিশু ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিদ্যালয় যে একটা কঠিন কারাগারে এ প্রসঙ্গে কবি বলেন—

যতটুকু আবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানব জীবনের ধর্ম নহে।— আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না! স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক। নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে দেশে ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না।

www.pathagar.com

—বাঙালীর ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোগত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বন করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুধুমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মশলা মিশানো নাই।

—বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিতে হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটা শিশু পুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বল লাভ করে।[৪০]

যে শিক্ষায় আনন্দ নেই, প্রাণ নেই আর যে শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মস্থ না করে শুধু মুখস্থ মাত্র—এ শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম শিক্ষা ও গোলামীর শিক্ষা বলেছেন—

> 'যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কখনও মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে। সে কি এক প্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না। সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে। সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না।'[৪১]

ভাষার কারাগারে আর বিদ্যালয়ের কারাগারে পিষ্ট হয়ে গানহীন, প্রাণহীন আনন্দহীন জীবনে আমাদের শিশু ও ছাত্ররা মনে ও প্রাণে জীর্ণ হয়ে উঠে এবং তাদের মানসিক ও আত্মিক বিকাশের কোনো পথই থাকে না। শেষ পর্যন্ত পড়াশুনার প্রতি তাদের একটা অনীহা ভাব জেগে উঠে। কবির উক্তি—

> 'কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় যে পথ এক প্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ভাষাশিক্ষার ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজি এতই বিদেশী ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এন্ট্রেন্স এবং ফার্স্ট-আর্টস পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি. এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়—তখন সেগুলো ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই—সবগুলো মিলাইয়া এক একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।
>
> যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই যে, স্তূপ উঁচা করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ইঁট সুরকি, কড়িবরগা, বালিচুন, যখন পর্বত প্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি আমরা সেই উপকরণস্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনোমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মতো দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে অট্টালিকা বলে। ইহার মধ্যে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোনো পথ আছে, ইহার মধ্যে মনুষ্যের

www.pathagar.com

চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোনো আশ্রয় আছে, ইহা কি আমাদিগকে বহিঃসংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে, ইহার মধ্যে কি কোনো একটা শৃঙ্খলা সৌন্দর্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়।'[৪২]

তোতাপাখির মতো মুখস্থ কতোগুলো নিরস ও কৃত্রিম বুলি নিয়ে আমরা একটা সার্টিফিকেট লাভ করি। অথচ দেশ, দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং দেশের মানুষ সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রেম ও ভালোবাসা গড়ে উঠে না—তাই দেশের চেয়ে আমাদের কাছে বিদেশই বড়ো হয়ে উঠে। মাতৃভাষার চেয়ে বিজাতীয় বিভাষী কিছু বুলি আওড়িয়ে আমরা জ্ঞানের অহংকার আর গর্ববোধ করে থাকি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

'আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলো একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সেগুলো মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।[৪৩]

জ্ঞান মানুষকে উদার করে সম্প্রসারিত করে, সংকীর্ণতা হতে, হীনমন্যতা হতে ক্ষুদ্র গণ্ডি হতে, অন্ধকার হতে ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি হতে মুক্ত জগতে ও আলোকে টেনে নেয়—বিশ্বসভায় সম্মিলিত করে দেয়—প্রথাবদ্ধতার আল ভেঙ্গে, প্রাচীর ভেঙ্গে মানুষকে মিলন ময়দানে বসিয়ে দেয়। দেশের শিকড়ের সন্ধান করিয়ে দেয়। আমরা আজ যে শিক্ষা পাই সে শিক্ষায় দিন দিন আমরা শিকড়চ্যুত হয়ে দেশ, মাটি ও মানুষ এবং দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিচ্যুত হয়ে পড়ি। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে-ভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে গৃহে আমৃত্যকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নতচিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না; আমাদের পিতা মাতা, আমাদের সুহৃৎ বন্ধু আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষা বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিবার যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানীগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের মামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌর দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।

www.pathagar.com

এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি জগৎ অন্যপান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শতসহস্র লতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন, একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত, তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনও সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।'[৪৪]

এই কৃত্রিম অসার ও জীবন বিমুখ শিক্ষা নিয়েই আমরা গর্ব করে থাকি এবং শিক্ষার তেজস্ক্রিয়তায় মানুষকে অপদস্ত করে থাকি—

'যাহা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয় ও জিনিসটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যেদিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে সেদিকে সভ্যতা নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা স্থির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে, আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতিমুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসারযাত্রা দুই-ই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।'[৪৫]

মাতৃভাষার প্রতি দেশের লোকের এই যে অবজ্ঞা এই অবজ্ঞার ফলেই দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে দেশের প্রতি আকৃষ্ট না করে দিন দিন তাদের বিজাতীয় ও বিভাষী করে তুলছে। কবির মনের এই বেদনাবোধ এখানে প্রকাশ পেয়েছে—

আজকালকার শিক্ষিতলোকে বাংলাভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু একমাত্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলাভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙালি কখানোই ইংরাজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে।

বঙ্গদেশের পরমদুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এ লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন সকল ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলাভাষার সহিত কোনো সম্পর্কে রাখে না। এমনকি, বাংলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাংলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাংলা গ্রন্থ অবজ্ঞাভরে অন্তপুরে নির্বাসিত করিয়া দেয়। ইহাকে বলে, 'লঘুপাপে গুরুদণ্ড'।

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র, কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য;

www.pathagar.com

নহিলে আছে সকলই। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।[৪৬]

শিক্ষার ভিত্ রক্ষা হবে জাতির অন্তর থেকে, জাতির তলদেশ থেকে আর তা হতে হবে মাতৃভাষায়। বাইরের আস্ফালনে মত্ততা থাকতে পারে কিন্তু এতে জাতির উন্নতি বিশেষ হবে না। আমরা ভাববো, চিন্তা করবো মাতৃভাষায় আর প্রকাশ করবো অন্যভাষায় তা কখনো হতে পারে না। এখনো এ ধরনের পরগাছা বৃত্তি—এতে জাতির দুর্গতি মোচন হয় না—স্বাদেশিক চেতনা জাগতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, এ কথা কে না বোঝে। কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সহজ কথা না বুঝিলে তাহার মতো কঠিন কথা আর নাই। কারণ, কথা না বুঝিলে সহজ কথার সাহায্য বুঝাইতে হয়, কিন্তু সহজ কথা না বুঝিলে আর উপায় দেখা যায় না।

দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়ীত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়ীত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই, এ কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

রাজা কত আসিতেছে কত যাইতেছে; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে, কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে; যাহা কিছু বাংলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায় তবে পরশু ওই বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধ বুদ্বুদের মতো প্রতীয়মান হইবে।

ভালোরূপে নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলোকে বুদ্বুদ বলিয়া বোঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোক প্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনো মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এইরূপ ধবলাকার, একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বুধারা।

শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত হইয়া চিরস্থায়ীত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।

এ সব কথা ইতিহাসে অনেকবার আলোচিত হইয়া গেছে, এবং অনেক ইংরেজ লেখকও এ কথা লিখিয়াছেন। জর্মানিতে যতদিন না মাতৃভাষার আদর হইয়াছিল ততদিন তাহার যথার্থ আত্মাদর এবং আত্মোন্নতি হয় নাই। শিক্ষাসভার যে সভ্যগণ মাতৃভাষার প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন তাঁহারা এ সমস্ত উদাহরণ অবগত আছেন, সেইজন্যই কথাটা তাঁহাদের বুঝানো আরও কঠিন, কারণ, বুঝাইবার কিছু নাই।

শিক্ষায় স্বদেশী ভাষা অবলম্বন করিলে কেন যে মনের বিশেষ উন্নতি হয় সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। যে সৌভাগ্যবান সভ্যজাতিরা দেশীভাষায় শিক্ষালাভ করে তাহারা প্রথম হইতেই ধারণা করিবার, চিন্তা করিবার অবসর পায়। আরম্ভ হইতেই তাহাদের ভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে। কেবল যে কতকগুলো মুখস্থ জ্ঞান অর্জন হয় তাহা নহে, মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।[৪৭]

'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের দৈন্যের চিত্র তুলে ধরেছেন। আমরা আমাদের মাতৃভাষার সম্মান করবো না, মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বাইরে ফেলে রাখবো আর অনাদর করবো—এই ধরনের মানসিকতা দেশপ্রেম হতে পারে না। দেশের মঙ্গল চাইলে প্রথমেই প্রয়োজন আমাদের মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা। কবি তাই বলেছেন—

"বঙ্গ সাহিত্যের কোনো গৌরব নাই। কিন্তু, সে যে কেবল বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যবশত তাহা নহে। গৌরব করিবার লোক নাই। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকজনের নিকট তাহার সমাদর থাকিতে পারে, কিন্তু একত্র সংহত সর্বসাধারণের নিকট তাহার কোনো প্রতিপত্তি নাই। কারণ, একত্র সংহত সর্বসাধারণ এ দেশে নাই।

www.pathagar.com

যে দেশে আছে সেখানে সকলে সাধারণ মঙ্গল অমঙ্গল একত্রে অনুভব করে। সেখানে দেশীয় ভাষা এবং সাহিত্যের অনাদর হইতে পারে না; কারণ যেখানে অনুভবশক্তি আছে, সেইখানেই প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা আছে। সেখানে সর্বসাধারণের ভাবের ঐক্যে অনুপ্রাণিত হয়, সেখানে সর্বসাধাণের মধ্যে ভাষার ঐক্য আবশ্যক হইয়া উঠে এবং এই সাধারণের ভাষা কখনোই বিদেশীয় ভাষা হইতে পারে না।

এইজন্য দেশীয় ভাষার প্রতি সাধারণের আদর নাই এবং দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগের স্বল্পতা দেখা যায়। লোকে যে অভাব অন্তরের সহিত অনুভ করে না সে অভাব পূরণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। অনেকে কর্তব্য বোধে কৃতজ্ঞ হইবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কিন্তু সে চেষ্টা কোনো বিশেষ কাজে আসে না।

আমাদের দেশে সাধারণের কোনো আবশ্যকবোধ না থাকাতে এবং সাধারণের আবশ্যক-পূরণজনিত গৌরববোধ লেখকের না থাকাতে, আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্র স্বভাবতই সংকীর্ণ হইয়া আসে এবং লেখকে পাঠকে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে না। সাহিত্য কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক শৌখিন লোকের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। অথচ, সেই সাহিত্য-শৌখিন লোকগুলি প্রাচীনকালের রাজাদিগের ন্যায় সর্বত্র-পরিচিত প্রভাবশালী মহিমান্বিত নহেন, সুতরাং তাঁহাদের আদরে সাহিত্য সাধারণের আদর লাভ করে না। কথাটা বিপরীত শুনাইতে পারে কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কিয়ৎপরিমাণে আদর না পাইলে আদর পাওয়ার যোগ্য হওয়া যায় না।[৪৮]

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের অনুবৃত্তিতে একথা তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন—

> "এদেশের ধান জন্মে বিলাতে জন্মায় ওক। এখানকার দেশী ভাষা বাংলা, ইংরেজী নহে। যদি কর্ষণ করিয়া সম্যক ফল লাভ করিতে হয় তবে বাংলায় করিতে হইবে, নতুবা ঠিক 'কালচার' হইবে না।"[৪৯]

বিজাতি বিভাষীয় বারবার আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং আমাদের জাতিসত্তার উপর আক্রমণ করেছে, বর্বর হামলা চালিয়েছে কিন্তু আমাদের স্বকীয়তাকে একটুও ম্লান করতে পারেনি। শিক্ষার সংস্কার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আয়ারল্যান্ড ও স্যাকসনের একটি উদাহরণ টেনেছেন। আমাদের মহান একুশের ভাষা আন্দোলন কবি গুরুর এই চিন্তাধারার একটি বাস্তব প্রতিফলন। কবির বক্তব্য—

> "প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন করিয়া গড়িয়াছেন যে, এক জাতিকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।"[৫০]

রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ "যে ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেকদিন লাগে। ততদিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি পেটা এবং কুলুপ খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো চৌদ্দ বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্যে ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে; সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থ বিদ্যায় শিলাবৃষ্টি বর্ষণ হইতে থাকে তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কী করিয়া?

এইরূপে শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সেকথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের ভাবনাচিন্তা, আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়, আমরা নকল করি, নজির খুঁড়ি এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি তাহা হয় কোনো না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার'। হয় মানসিক ভীরুতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্ধাবশত বেড়া ডিঙ্গাইয়া চলিতে থাকি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্বতা আছে, একথা কোনোমতেই স্বীকার্য নহে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা আছি, সময়ের মধ্যে যতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছি, সে আমাদের নিজের গুণে।'[৫০ক]

www.pathagar.com

আমরা সবকিছুতেই পরের উপর নির্ভর করে থাকি—আমাদের শিক্ষার ভারও আমরা পরের উপরই দিয়েছি। অথচ আমাদের শিক্ষার উপায় আমরা নিজেরা উদ্ভাবন না করলে পরের ছাঁচে গড়া শিক্ষায় আমাদের ছাত্ররা কখনো মানুষ হতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে থাকবে দেশের মাটির গন্ধ এবং দেশের প্রকৃতি ও আবহ। তাই তিনি বলেছেন—

> 'নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমন তরো মানুষ তৈরী করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের যোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরীর বিধান অন্যরূপ।
>
> দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব। অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না। তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্র বিকার—বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।"[৫১]

রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই বাইরের নয় ভেতরের জাগরণ চাইতেন। আর তিনি এও ভালো করে জানজেন যে, দেশের ভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত এ জাগরণ সম্ভব নয়। 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি এ বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন—

তখন বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মুখে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ এবং সুবৃহৎ জনমণ্ডলী উপস্থিত ছিল—তাহাই যথার্থ সাহিত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি। স্বার্থও নহে, খ্যাতিও নহে, প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধি কাল এবং বিপুল পৃথিবী। সেই লক্ষ্য থাকে বলিয়াই সাহিত্য মানবের সহিত মানবকে, যুগের সহিত যুগান্তরকে প্রাণবন্ধনে বাঁধিয়া দেয়।

আজ আমরা একথা বলিয়া অলীক গর্ব করিতে পারিব না যে, আমাদের অদ্যকার তরুণ বঙ্গসাহিত্য পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী বয়স্ক সাহিত্যসমাজে স্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের যশস্বিবৃন্দের সংখ্যা অত্যল্প, আজিও বঙ্গসাহিত্যের আদরণীয় গ্রন্থ গণনায় যৎসামান্য, একথা স্বীকার করি। কিন্তু স্বীকার করিয়াও তথাপি বঙ্গসাহিত্যকে ক্ষুদ্র মনে হয় না। সে কি কেবল অনুরাগের অন্ধ মোহবশত? তাহা নহে। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন সে আপন ভাবী সম্ভাবনাকে আপনি সচেতনভাবে অনুভব করিতেছে। এইজন্য বর্তমান প্রত্যক্ষ ফল তুচ্ছ হইলেও সে আপনাকে অবহেলাযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। বসন্তের প্রথম অভ্যাগমে যখন বনভূমিতলে নবাঙ্কুর এবং 'তরুশাখায় নবকিশলয়ের প্রচুর উদ্‌গম অনারব্ধ আছে, যখন বনশ্রী আপন অপরিসীম পুষ্পৈশ্বর্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই, তখনো সে যেমন আপন অঙ্গে-পত্যঙ্গে শিরায়-উপশিরায় এক নিগূঢ় জীবনসঞ্চার, এক বিপুল ভারী মহিমা উপলব্ধি করিয়া আসন্ন যৌবনগর্বে সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠে—সেইরূপ, আজ বঙ্গসাহিত্য আপন অন্তরের মধ্যে এক নূতন প্রাণশক্তি, এক বৃহৎ বিশ্বাসের পুলক অনুভব করিয়াছে; সমস্ত বঙ্গহৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার আন্দোলন সে আপনার নাড়ীর মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে; সে জানিতে পারিয়াছে সমস্ত বাঙালির অন্তর-অন্তঃপরের মধ্যে তাহার স্থান হইয়াছে, এখন সে ভিখারিণীবেশে কেবল ক্ষমতাশালীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদের তাহার অক্ষুন্ন অধিকার প্রতিদিন বিস্তৃত এবং দৃঢ় হইতে চলিয়াছে। এখন হইতে সে শয়নে-স্বপনে সুখে-দুঃখে-সম্পদে-বিপদে সমস্ত বাঙালির.....

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ ॥[৫২]

www.pathagar.com

সেদিনকার উচ্চশিক্ষার নামে গর্বিত ও আত্মভিমানীরা মাতৃভাষা বাংলাকে কখনো শিক্ষিতজনের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ মানসিকতা ছিলো না। তিনি বিশ্বাস করতেন—

> ইংরাজি কোন উপায়েই আমাদের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। কারণ তাহা অত্যন্ত উৎকট বিদেশী। এবং যে সকল ভাষার ভিত্তি বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন এবং মহৎ সংস্কৃত বাণীর মধ্যে নিহিত এবং যে সকল ভাষা বহু সহস্র বৎসরের পুরাতন কাব্য দর্শন সমাজরীতি ও ধর্মনীতি হইতে বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া নরনারীর হৃদয়কে বিবিধরূপে সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কখনোই মরিবার নহে।[৫৩]

বাংলাভাষা অন্য কথায় বলা যায় মাতৃভাষা বাংলা প্রশ্নে রবীন্দ্র মানসে কোনো খণ্ডিত রেখা বা সীমাবদ্ধতা ছিলো না। ইংরেজ আমাদের অনেক ক্ষতির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি ও সবচেয়ে বড়ো শত্রুতা করেছে শিকল টেনে বাংলাদেশকে বিভক্ত করে। আজকের বাংলাদেশ ইংরেজের শিকলটানা খণ্ডিত বাংলাদেশ। এই শিকল টেনে খণ্ডিত করার ফল এতোদিনে আমরা ভোগ করতেছি। আমাদের আজ ভাষাবিচ্ছেদ হয়েছে, জাতি বিচ্ছেদ হয়েছে, আমাদের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে—শত্রুতা ও সাম্প্রদায়িকতা বেড়েছে। ভাইয়ের বুকে ছুরি মেরেছে সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ততায় আমরা রক্তের হোলি উৎসব করেছি।

পাকিস্তান আমলে এই শত্রুতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা আরো বেশি চরম ও উৎকট রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ অতীব সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন এর মূলে রয়েছে ভাষা বিচ্ছেদ। চর্যাপদের ভাষা নিয়ে যে এতো বিতর্ক ও সমস্যা এর মূলেও এই ভাষা বিচ্ছেদ। ইংরেজের শিকল টানা বাংলাদেশের বৃত্তে আবদ্ধ বলেই আজ আমাদের ভাষা সমস্যা ও জাতিগত সমস্যা এবং আমাদের ভাষা ও জাতিসত্তা নিয়ে এতো বিতর্ক।

আমাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা চেতনা এবং সাধনা ও ব্রত বাঙালির স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে উজ্জ্বল ও ভাস্বর করে তোলা। এর অর্থ এই নয় যে আমরা আল তুলে প্রাচীর বেঁধে অচলায়তনে বন্দি হয়ে থাকবো। মহৎ ভাব সম্পদ, চিন্তাচেতনা ও মাল-মসলা এবং উপকরণের জন্য আমরা সমগ্র বিশ্বের কাছেই হাত পাতবো—তবে পরের কাছ থেকে যা নেবো তা আত্মস্থ করে ও হজম করে নেবো অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টি থাকবে আকাশের দিকে, সমগ্র বিশ্বের দিকে কিন্তু আমারে পা থাকবে দেশের মাটিতে। আমাদের শিকড়সন্ধানী হতে হবে এবং আমাদের উৎসের ও স্বরূপের সন্ধান করতে হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বিশেষত বাংলা কবিতার আদি নিদর্শনেই আমাদের পরিচয়ের উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযোদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ে আমরা আমাদের আত্মপরিচয় নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মাটিতে গর্বের সাথে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু আমাদের পরিচয় একাত্তর থেকেই নয়—আমাদের পরিচয় সে সুপ্রাচীনকাল থেকেই। আমাদের পরিচয় চর্যাপদে নাথ সাহিত্যে, পদাবলী লোক সাহিত্যে, গাঁথা-পুঁথি সাহিত্যে, বাউল ও মারফতী সাহিত্যে।

আমাদের প্রকৃত পরিচয় পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে, মহাস্থানগড়ে এবং বরেন্দ্র ও সমতটে। আমাদের পরিচয় মঠ বিহারে মন্দিরে ও মসজিদে। এসব থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলা কবিতার ইতিহাস এবং বাঙালিত্ব ও বাঙালির পরিচয় হতে পারে না এবং আমাদের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনাও সম্ভব নয়।

আমাদের যতোদিন পর্যন্ত চর্যাপদ ও নাথ পদাবলী ও মরমী সাহিত্য, গাঁথা ও পুঁথি সাহিত্য, বাউ ও মারফতী থাকবে এবং যতোদিন পর্যন্ত আমাদের মীন নাথ ও ভুসুক থাকবে, সত্যপীর, পাঁচপীর ও খোয়াজ খিজির থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত শাহসগীর, আলাওল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থাকবে, লালন ও হাছনরাজা থাকবে, যতোদিন পর্যন্ত মধুসূদন, বরীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ ও শামসুর রাহমান থাকবে এবং যতোদিন পর্যন্ত আমাদের জয়নুল ও কামরুল থাকবে ততোদিন পর্যন্ত আমাদের পরিচয়কে কেউই ম্লান করতে পারবে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলা কবিতা আমাদের এ পরিচয়কে ও আমাদের সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকেই উজ্জ্বল ও দীপান্বিত করে তুলেছে।[৫৪]

www.pathagar.com

বাঙলা ও বাঙালি এবং ভাষা ও জাতিসত্তায় রবীন্দ্রনাথের কোনো সংকীর্ণতা ছিলো না বলেই তিনি গেয়েছেন—

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥

এই এক হওয়া থেকে—এই ঐক্য থেকে সুচতুর ইংরেজ ধূর্ততামীর মাধ্যমে আমাদের শুধু পৃথকই করেনি শত্রুতাও সৃষ্টি করেছে ভাষা বিচ্ছেদের মাধ্যমে। আমি প্রবন্ধের আরো কিছু অংশ তুলে ধরেছি—

উড়িষ্যা এবং আমাদের বাংলাশিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপরিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া একদিন একগৃহবর্তী হইতে পারিত।

সামান্য অন্তরাল এইজন্যই বলিতেছি যে, বাংলাভাষার সহিত আসামি ও উড়িষ্যার যে-প্রভেদ সে-প্রভেদসূত্রে পরস্পর ভিন্ন হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। উক্ত দুই ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা অপেক্ষা বাংলা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীরভূমের কথিত ভাষার সহিত ঢাকার কথিত ভাষার যে প্রভেদ, বাংলার সহিত আসামির প্রভেদ তাহা অপেক্ষা খুব বেশি নহে।

কিন্তু, যদি একীকরণ ইংরেজ রাজত্বের স্বাভাবিক গতি, তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে ভেদনীতি ইংরেজের রাজকৌশল। সেই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আমাদের ভাষার ব্যবধানকে পূর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাধিত করিয়া স্থানীয় ভাষাগুলিকে কৃত্রিম উত্তেজনায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত।

স্থানীয় চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা বাঙালির বিরুদ্ধে যে গণ্ডি টানিয়া দিয়াছেন এবং সেই সূত্রে বেহারি প্রভৃতি বঙ্গশাখীদের সহিত বাঙালির যে একটি ঈর্ষার সম্বন্ধ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা আমরা স্বল্প অশুভেরই কারণ মনে করি; কিন্তু ভাষার ঐক্য যাহা নিত্য, যাহা সুগভীর, যাহা আমাদের এই বিচ্ছিন্ন দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহাকে আপন রাজশক্তির দ্বারা পরাহত করিয়া ইংরেজ আমাদের নিরুপায় দেশকে চিরদিনের মতো ভাঙিয়া রাখিতেছেন।

ইংরেজি ভাষা কোনো উপায়েই আমাদের দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। কারণ, তাহা অত্যন্ত উৎকট বিদেশী। এবং যে সকল ভাষার ভিত্তি বহুসহস্র বৎসরের প্রাচীন ও মহৎ সংস্কৃত বাণীর মধ্যে নিহিত, এবং যে সকল ভাষা বহুসহস্র বৎসরের পুরাতন কাব্য দর্শন সমাজরীতি ও ধর্মনীতি হইতে বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া নরনারীর হৃদয়কে বিবিধরূপে সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কখনোই মরিবার নহে।

কিন্তু সেই সংস্কৃতমূলক ভাষা রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাধায় শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্থানে স্বতন্ত্ররূপে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের মধ্যে শক্তিপরীক্ষা ও যোগ্যতমের প্রচেষ্টার অবসর হয় নাই।

এক্ষণে সেই অবসরের সূত্রপাত হইয়াছিল। এবং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বাধীন হস্ত থাকে তবে বাংলাভাষার পরাভবের কোনো আশঙ্কা নাই।

প্রথমত, বাঙালি ভাষীর জনসংখ্যা ভারতবর্ষের অপরভাষীর তুলনায় অধিক। প্রায় পাঁচ কোটি লোক বাংলা বলে।

www.pathagar.com

কিন্তু আপন সাহিত্যের মধ্যে বাংলা যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে তাহাতেই তাহার অমরতা সূচনা করে।

এক্ষণে ভারতবর্ষে বাংলা ছাড়া বোধ হয় এমন কোনো ভাষাই নাই, যে ভাষার আধুনিক সাহিত্যের ইংরেজি শিক্ষিত এবং ইংরেজি-অনভিজ্ঞ উভয় সম্প্রদায়েরই সজাগ ঔৎসুক্য। অন্যত্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্যই দেশীয় ভাষা প্রধানত অবলম্বনীয় জ্ঞান করেন,— কিন্তু তাঁহাদের মনের শ্রেষ্ঠভাব ও নূতন উদ্ভাবন সকলকে তাঁহারা ইংরেজি ভাষায় রক্ষা করিতে ব্যগ্র।

বাংলাদেশে ইংরেজিতে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস প্রায় তিরোধান করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যে সকল ছাত্রের রচনা করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, বাংলা সাহিত্য অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে, আমাদের সাহিত্য এমন একটি সবেগতা, এমন একটি প্রবলতা লাভ করিয়াছে। চতুর্দিকে জীবনদান এবং জীবনগ্রহণ করিবার শক্তি ইহার জন্মিয়াছে। ইহার দেশপরিধি যত বাড়িবে ইহার জীবনীশক্তিও তত বিপুলতর হইয়া উঠিবে। এবং বেগবান বৃহৎ নদী যেমন যে দেশ দিয়া যায় সে দেশ স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে বাণিজ্যে ও ধনে-ধান্যে ধন্য হইয়া উঠে, তেমনই ভারতবর্ষে যতদূর পর্যন্ত বাংলা ভাষার ব্যাপ্তি হইবে ততদূর পর্যন্ত একটা মানসিক জীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া দুই উপকূলকে নিত্য নব নব ভাবসম্পদে । ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিবে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, আসাম ও উড়িষ্যার বাংলা যদি লিখনপঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাংলা সাহিত্যের পক্ষে শুভজনক হইবে তেমনই সেই দেশের পক্ষেও।

কিন্তু ইংরেজের কৃত্রিম উৎসাহে বাংলার এই দুই উপকণ্ঠবিভাগের একদল শিক্ষিত যুবক বাংলা প্রচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা তুলিয়া স্থানীয় ভাষার জয়কীর্তন করিতেছেন।

এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, দেশীয় ভাষা আমাদের রাজভাষা নহে, আসামির সহিত হিন্দুস্থানির আর কোনো সাদৃশ্য নাই এবং তাহার সমস্ত সাদৃশ্যই বাংলার সহিত।

যাহাই হউক, যে ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে অবাধ ভাবপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত, তাহাকেই প্রাদেশিক অভিমান ও বৈদেশিক উত্তেজনায় পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীনস্বরূপে দৃঢ় ও উচ্চ করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা তাহাকে স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং তাহা সর্বতোভাবে অশুভকর।[৫৫]

তিন

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষা প্রসঙ্গে 'শিক্ষা সমস্যা' রবীন্দ্রনাথের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। শিক্ষায় যান্ত্রিকতা রবীন্দ্রনাথ কখনো পছন্দ করতেন না। যান্ত্রিক শিক্ষায় ছাঁদে ঢালা মানুষ কখনো মানুষ হয়ে উঠতে পারে না অথচ আমাদের শিক্ষা একান্তভাবেই যান্ত্রিক। আমাদের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় যেনো এ ধরনের একটা কল বা কারখানা মাত্র। কল বা কারখানা থেকে যেমন একই ছাঁচে জিনিস বের হয়; বৈচিত্র্য নেই— আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাই ঠিক তাই। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—

> "ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয় মাস্টারের মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।"[৫৬]

ইউরোপের বিদ্যালয় থেকে যে সৃজনশীল মানুষ বের হচ্ছে এর মূল কারণ সেখানকার শিক্ষার সাথে মাটি ও পরিবেশ এবং দেশ জীবন আবহের একটা সম্পৃক্ততা আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

www.pathagar.com

মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা-লাভ করে সে বিদ্যাটি সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে, সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানাভাবে তাহার বিকাশ হইতেছে, সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানাভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজে-কর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে, তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই—যাহা বাহির হইতে সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব, তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ না, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে, তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।[৫৭]

বিলাতের শিক্ষা আর আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা। বিলাতের নজির দিয়ে ঐ ছাঁচে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি হতে পারে না।

'বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন আদর্শ বহুদিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ের রস সঞ্চার হয় কিসে তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা ইংরেজী স্কুলে পড়িয়াছি, যেদিকে তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে, আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয়, অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনও বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।'[৫৮]

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিক্ষা বা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি কটাক্ষ করেননি কিন্তু আমাদের শিক্ষা যে একদিন মাটি, মানুষ ও জীবনের অনুষঙ্গ ছিলো এ কথা তিনি বার বার বলেছেন—

> 'আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন।.....
> পুথির পড়াটাই সবচেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারিদিকেই অধ্যয়ন অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ওই পড়া লইয়া আছেন, শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধে; বৈষয়িক বিলাসিতা মনকে টানা ছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময়ও সুবিধা পায়।'[৫৯]

ছোট বেলায় পড়িছিলাম 'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে'। শুধু দাঁগানো কয়েকটি প্রশ্ন মুখস্থ করে আর বিদ্যালয় স্বরূপ কারাগারে বন্দী থেকে এ উদার শিক্ষা লাভ সম্ভ নয়।এজন্যই চাই নদীর প্রবাহ, ঝর্ণার গান, উন্মুক্ত আকাশ ও প্রাঙ্গণ এবং বনের ও প্রকৃতির সমারোহ। কবির ভাষায়—

তথাপি, খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার

www.pathagar.com

সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না। স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষ প্রথমযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে; এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানাবর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই; তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইনস্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্ন পত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বন, এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তণ হইয়া থাক্ এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।[৬০]

বিদ্যা বাজারে পণ্য নহে যে তা বেচাকেনা চলবে। জ্ঞানদান মানেই ভাবের আদানপ্রদান। এ হৃদয়ে মনে মনে সঞ্চারিত হবে। যেমন সক্রেটিশ থেকে প্লেটো আর প্লেটো থেকে এ্যারিষ্টটল। ভাবের বিনিময় হলেই এখানে স্বার্থ নেই—আছে আত্মিক সম্পর্ক। হেরা পর্বতে এজন্য মহানবী আর জিব্রাইলের মধ্যে ঐশী বাণী বিনিময়ের পূর্বে বুকে বুকে আলিঙ্গন হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

> আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে কিন্তু তাহার পণ্য তালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতির হৃদয়ের সামগ্রী থাকবে এমন

www.pathagar.com

কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন—এইখানে ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন—সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্য গুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন—যদি তাহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরব লাভ করিতে পারেন—তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্য দ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।[৬১]

আমরা উৎসের সন্ধানী ও শিকড় সন্ধানী নই। আমরা কখনো পরিচয় ও স্বরূপের সন্ধানে তৎপর নই। আমাদের শিশুদের বিজাতীয় স্বভাবে ও মেজাজে গড়ে তোলাকেই আমরা গর্ববোধ করি।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলা সমাজ হইতে যে শত সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল সজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়—অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে।[৬২]

দেশকে ভালোবাসা মানে দেশের ভাষা ও সাহিত্যকেও ভালোবাসা। কিন্তু আমরা মুখে দেশ প্রেমের কথা বলি আবার সর্বক্ষেত্রেই সাহেবীপনার বাহাদুরীও করে থাকি। অথচ দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখি—। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষার বিরোধিতা করেননি। যেখানে ইংরেজীর প্রয়োজন ও আবশ্যক সেখানে তিনি অবশ্য ইংরেজী ব্যবহারের পক্ষে—

....যেখানে ইংরাজি বলা দরকার সেখানে অবশ্য ইংরাজি বলিবে। কিন্তু তোমার ভাষাটা কী? তোমার লেখাপড়া ধ্যানধারণা মন্ত্রতন্ত্র সমস্তই ইংরাজিতে কি না? জনসভার বাহিরে দেশের সহিত তুমি কিরূপ সংস্রব রাখিয়া চল? ইংরাজি ভাষায় যেটুকু কর্তব্য তাহা যেন সাধন করিলে, কিন্তু দেশী ভাষায় যে কর্তব্যপুঞ্জ পড়িয়া আছে, যাহা কাগজে রিপোর্টের জন্য নহে, যাহা সমুদ্রপারে উদ্‌বেলিত হইবার জন্য নহে, যাহা ফলাফল যাহার ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুধুমাত্র আমাদের দেশীমণ্ডলীর মধ্যে বদ্ধ, তাহাতে হাত দিতে তোমার মন উঠে?... ইংরাজের সহিত সমান অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইবার জন্য ইংরাজি ভাষা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশকে উচ্চতর অধিকারের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় ভাষা দেশীয় সাহিত্য দেশীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের উন্নতিসাধন একমাত্র উপায়। যাঁহারা স্বদেশ অপেক্ষা আপনাকে অনেক ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত বলিয়া জানেন, যাঁহারা স্বদেশের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে লজ্জাবোধ করেন যাঁহারাও স্বদেশকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, স্বীকার করি। কিন্তু সেটুকু না করিয়া যদি তাঁহারা নিজের দেশকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন এবং নিজেকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তবে তাহাতে তাঁহাদের আত্মসম্মান থাকে এবং দেশকেও সম্মান করা হয়।[৬৪]

দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে একদিন এমন একটা হীনমন্যতাও গড়ে উঠেছিলো যে বাংলা বই পড়াকেও তারা সাহেবীপনা নষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করতো। বাংলা বই অন্তপুরে মেয়েরাই পড়তো বেশি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

একদিন শিক্ষিত পুরুষ সমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তখন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্জার সহিত কৈফিয়ৎ দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাড়ির ভিতরে মেয়েরা পড়িবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাঁহাদের সে লজ্জায় ভার আমরাই বহন করিয়াছি,

www.pathagar.com

কিন্তু ত্যাগ করি নাই। আজ তো সে লজ্জার দিন ঘুচিয়াছে। যে বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলে বাংলাদেশের শিশুসন্তানেরা—তাহারা কালোই হউক আর ধলোই হউক—পরম আদরে মানুষ হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গসাহিত্যও সেই বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অন্নবস্ত্রের দুঃখ পায় নাই।[৬৪]

'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ তিনি বলেন—

বিদেশী শাসনকালে বাংলা দেশের যদি এমন কোনো জিনিসের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা লইয়া বাঙালি যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলা সাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ, বাংলা সাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই। পূর্বে প্রত্যেক বাংলা বই সরকার তিনখানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে পাই এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। ভালোই করিয়াছেন। গবর্মেন্টের উপাধি-পুরস্কার-প্রসাদের প্রলোভন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই, এই সাহিত্য বাঙালির স্বাধীন আনন্দ উৎস হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই সাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি। হয়তো গণনায় বাংলা ভাষায় উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ সংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয়তো বিষয়বৈচিত্র্য এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পদশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু তবু ইহাকে আমরা বর্তমান অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বড়ো করিয়া দেখিতে পাই—কারণ, ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে, নিজের অন্তরের মধ্যে উদ্ভূত হইতেছে। এ ক্ষীণ হউক, দীন হউক, এ রাজার প্রশ্রয়ের প্রত্যাশী নহে—আমাদেরই প্রাণ ইহাকে প্রাণ জোগাইতেছে। অপরপক্ষে, আমাদের স্কুল-বইগুলির প্রতি ন্যূনাধিক পরিমাণে অনেকদিন হইতেই সরকারের গুরুহস্তের ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে এই বইগুলির কিরূপ বাহির হইতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই।

এই-যে স্বাধীন বাংলাসাহিত্য যাহার মধ্যে বাঙালি নিজের প্রকৃত শক্তি যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়ীজালের মতো বাংলার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে; তাহার মধ্যে এক চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছি, যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভা স্থাপন হয় তবে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন সভ্যগণের একটি বিশেষ কার্য হইবে। বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলাসাহিত্য যত উন্নত সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাতিহ্যই বাঙালি জাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে।[৬৫]

বিদেশী ভাষায় এতোদিন ভিক্ষে কুড়িয়ে আমরা লাভের অপেক্ষা যে ঘৃণা ও লাঞ্ছনাই কুড়িয়েছি এবং জাতীয় মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছি 'সাহিত্য সম্মেলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন—

'আমরা বিদেশী ভাষার পরের দরবারে এতকাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম তাহাতে লাভের অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই জমিল, আর দেশী ভাষার স্বদেশী হৃদয় দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম অমনি মুহূর্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন।'[৬৬]

দেশ আমাদের, ভাষা আমাদের অথচ আমরা দেশের ভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকবো—অবহেলা করবো এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে?

দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কতো বড়ো গালি তাহা অনুভব করি না। বেদনা সম্বন্ধে সংজ্ঞা না থাকা যেমন রোগের চরম অবস্থা তেমনি যখন হীনতার লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আমাদের চেতনাই থাকে না তখনই বুঝিতে হইবে, দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির এই লজ্জাহীনতাই চরম লজ্জার বিষয়। আমাদের দেশে এই একান্ত অসাড়তার ছোটো বড়ো প্রমাণ সর্বদাই দেখিতে পাই। বাঙালি হইয়া বাঙালিকে, পিতাভ্রাতা আত্মীয় স্বজনকে ইংরেজিতে পত্র লেখায় কতো বড়ো লাঞ্ছনা তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না, আমরা যখন অসংগত করতালি দ্বারা স্বদেশী বক্তাকে এবং হিপ্ হিপ্ হুররে ধ্বনিতে স্বদেশী মান্য ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

উৎসাহ জানাইয়া থাকি তখন সেই কর্ণকটু বিজাতীয় বর্বরতায় আমরা কেহ সংকোচমাত্র বোধ করি না।[৬৭]

শিক্ষার পরগাছাবৃত্তি ও পুচ্ছানুবৃত্তি এবং পরানুগ্রহিতাকে রবীন্দ্রনাথ সাংঘাতিকভাবে ধিক্কার দিয়েছেন। অথচ আমাদের মধ্যে এ দোষগুলোই বেশি। পাশ্চাত্য শিক্ষার মত্ততায় আজ আমরা টালমাটাল অথচ আমরা কি কখনো আমাদের শিক্ষা শিকড়ের সন্ধান নিয়েছি? আমাদের শিক্ষার কি কোনো গৌরবময় ঐতিহ্য ছিলো না, যে শিক্ষার শিকড় দেশের মাটি ও স্বাভাবিকত্বের ভেতরে প্রোথিত ছিলো? 'শিক্ষায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না'।[৬৮]

রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভের সাথে আরো বলেছেন—

> যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া যাইতে চায়। যতোই বলি না কেন শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্চে রাখিব, কায়দাটাকে আমাদের মত করিতে দাও—সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কি না, ওই কায়দাইতো শিক্ষা। তাই তোমাদের ভালো জন্য কায়দাটাকে যথাসাধ্য দুঃসাধ্য করিয়া তুলিব।[৬৯]

আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সংগ্রাম করেছেন তা আজও আমাদের কাছে অনেকটা অগোচরেই রয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনট্রেন্স ও এফ, এ পরীক্ষায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে মর্যাদা দানের সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের অবদান আমরা অনেকেই স্মরণ করিনে।

১৩০১ সালে এন্টেন্স ও এফ,এ পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল, ও অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ের উত্তর যাতে বাংলায় লেখা যায় সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন উপরোক্ত বিষয়গুলো মাতৃভাষা বাংলায় উত্তর লেখার জন্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। অনেক সংগ্রামের পর ১৩০১ সালে এন্ট্রেস পরীক্ষার পাঠ্য হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি লাভ করে। ঠিক এর দুবছর পর বাংলা ভাষার কবি নোবেল প্রাইজ, পেলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা কোনো মর্যাদা পায়নি। 'শিক্ষার বাহনে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞানই হইয়াই থাক, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?
>
> বলাবাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই, শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি-জার্মান শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা এ কথা কোন মুখে বলা যায়?[৭০]

বাংলা ভাষা যে নিজের গুণে ও ঐশ্বর্যেই বিশ্বের দুয়ারে, গৌরবের আসনে মহিমান্বিত কবি একথাও দৃঢ়তার সাথে বলেন—

> "একদিন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি নিজের লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা সাহিত্যের ছোট একটি অঙ্কুর বাংলা হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল—তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল—কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়,

www.pathagar.com

আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ, বাংলা সাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না—আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম নয়—বাহিরের সেই-সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনাদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা তাহা হইলে জগতের যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।[৭১]

শিক্ষাবিস্তারে এবং মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত করার ব্যাপারে আমাদের অবহেলার কথা বলতেও রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাবোধ করেননি।

.....আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইন্‌বোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে, সে কি চিন্তায় কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।[৭২]

বাঙালির ছেলে ইংরেজিতে দক্ষ হলেই দেশের মঙ্গল হবে না রবং অধিতবিদ্যাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মস্থ করতে না পারলে দেশের মঙ্গল হবে না। "দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই হাতুড়ি পেটাপেটি করতে হয়, সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্জে মশায় ওরই মধ্যে এক জায়গার একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন। তিনি যেটুকু, করিয়া দিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজিবিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরো হইবে না।"[৭৩]

বিশ্ববিদ্যালয় হবে আমাদের দেশের আর এর শিক্ষাব্যবস্থা হবে বিজাতীয় ও বিভাষায়—এমন তরো শিক্ষায় মানুষ কখনো মানুষ হতে পারে না এবং এ শিক্ষায় কখনো স্বাদেশিকতা ও দেশত্মবোধ জাগতে পারে না—

বিশ্বব্যিালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাইরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আম-দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহুত যারা তারা ভিতর-বাড়িতেই বসুক, আর যারা রবাহুত তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক্-না। তাদের জন্য বিলেতি টেবিল না হয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দারোয়ান দিয়া ধাক্‌কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই-স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।[৭৪]

পরের ভাষায় মানুষ পরগাছা হতে পারে এবং দর্প, গর্ব ও অহংকারে আস্ফালন করতে পারে কিন্তু প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। পুনরুক্তি হলেও উক্তিটি আবার এসে যায়।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদেন মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে, তার পরে

www.pathagar.com

আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায় যে খায় প্রচুর তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখিতে আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ, আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপূর্তি করে না।[৭৫]

তাই দেখা যায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হতে আমরা যে শিক্ষালাভ করি এতে জীবন মন ও আত্মার বিকাশ ঘটে না—আমাদের আচার ও আচরণের শিক্ষার কোনো লক্ষণই প্রকাশিত হয় না—। আমরা সবাই একই ছাঁদে তৈরি হই।—

... ...আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাকাশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে-ঢালাই করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁদে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই, ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা ইংরেজি চালুনি ফাঁক দিয়ে যা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজারে-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেকেকেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রী লইতেই হয়, কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয়, যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশ মতো বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরাজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারা বর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবে।[৭৬]

বিদেশী ভাষা আমরা যতোই শিখি না কোনো—তা' বাইরেই থেকে যায়। ভাষাকে ভাব প্রকাশের জন্য আত্মস্থ করতে না পারলে, রক্ত প্রবাহের সাথে স্পন্দমান করতে না পারলে এ ভাষায় যা বলি নিজের হতে পারে না। মাতৃভাষা ছাড়া এ কখনো সম্ভব হতে পারে না। জাপান যে আজ এতো উন্নতি করেছে এর মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে মাতৃভাষায় আত্মস্থ করে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

বিদ্যা বিস্তার কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাঁধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানী রপ্তানী করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

www.pathagar.com

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া একটু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষা আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইবে?পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তারা দেশীয় ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।[৭৭]

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা বলে আমাদের কোন অপরাধে অপাঙ্‌তেয় হয়ে থাকতে হবে এ প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উপর তিনি বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন—

> "যতদিন পর্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।"[৭৮]

শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> "আমাদের ভরসা এতই কম যে, স্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ-নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরব নাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতরে উপর বাঙলার অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণ-স্তম্ভের মতো স্থানু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স, তার উপরে দেশে যে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্‌বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই-যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালি ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।[৭৯]

সবচেয়ে অবাকের বিষয় উচ্চশিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় কোনো বই নেই এ ধরনের কথা আজও আমরা বলছি। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন কিন্তু এক শ্রেণীর লোকের কাছে আজও বাংলাভাষা অবজ্ঞাত ও অপরিচিত ভাষা হিসাবে ঘৃণিত ও অবহেলিত।

যে ভাষায় প্রকাশিত কাব্য ও চিন্তা চেতনা বিশ্বচৈতন্যকে আলোড়িত করেছে সে ভাষা নাকি আজও অফিস-আদালতের ভাষা হিসেবে এবং কারিগরী, প্রকৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও উচ্চশিক্ষার বাহন হবার অনুপযুক্ত। অনেক পণ্ডিত আবার গর্ব ভরে বলে থাকেন যে, "আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছি তাই ইংরেজিটাই আমার কাছে সহজ এবং বাংলা বলতে গেলেই ভুল করি।" ভাবটা এই যে, ইংরেজিটা তার মাতৃভাষা হয়ে গেছে। আমাদের ধারণা শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে যারা ভালো বাংলা জানে তারা ভালো ইংরেজিও জানে এবং যারা ভালো ইংরেজি জানে তারা ভালো বাংলাও জানে। এমনতরো দৃষ্টান্তের অভাব নেই—উভয় বাংলার সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখই যথেষ্ট। অফিষ আদালতে যারা বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে কাজ চালানো সহজ মনে করে তারা আসলে বাংলা বা ইংরেজি কোনোটাই ভালো জানে না। একটা বিশেষ 'গত' বা ফরমা তাদের রপ্ত বা মুখস্থ এবং এখানেই তাদের চাতুর্য। এর বাইরে গেলেই ইংরেজি বা বাংলা কোনটাতেই তারা দক্ষতা দেখাতে পারে না। তবে এ 'গত' বা ফর্মাটা যেহেতু ইংরেজিতে সাজানো তাই তারা ইংরেজির পক্ষপাতী।

বিজাতি বিভাষীরা যখন বাংলা শিখে বাঙালির লেখা বাংলা বইয়ের ভূমিকা লিখে দেন, প্রাঞ্জল বাংলায় তারা বাংলা সাহিত্যের উপর গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন—তখন স্বাভাবিক

www.pathagar.com

ভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এরা কোন বঙ্গসন্তান যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে মাতৃভাষাকে দেদার ভুলে গেছেন বলে গর্ব বোধ করেন।

আরেক দল পণ্ডিত বছরের পর বছর আবেগভরে দুঃখ প্রকাশ করে বেড়াচ্ছেন যে, বাংলায় কোনো রেফারেন্সের বই নেই, সুতরাং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা কখনো সম্ভব নয়। সবিনয়ে বলছি, বিদেশীরা যে সমস্তই বই লিখেন তা তারাতো তাদের মাতৃভাষায়ই লিখেন এবং এ বিষয় নিয়ে তারা চর্চা ও গবেষণা করেন বলেই তা সম্ভব হয়। কোনো দেশের বই-ই ঠিকাদাররা লিখেন না, যারা এ সমস্ত বিষয় নিয়ে চর্চা করেন তারাই লিখেন—তবে কি আমাদের জন্য রেফারেন্সের বইও বিদেশী ঠিকাদারদের দিয়ে লিখিয়ে নিতে হবে!

রবীন্দ্রনাথ এই মামুলি যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক আগেই বলেছেন—

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াছেন। তাঁদের কাজ ঢিলা চালে চলিতেছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কৈ? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আব্দার করি কোন্ লজ্জায়?[৮০]

আমরা জোর করে আমাদের ছাত্রদের ইংরেজি ভাষা হয় মুখস্থ করতে দেই অথবা গিলতে দিই—অথচ ভাষাকে একটুও আয়ত্ব করতে পারে না বলে অনেকক্ষেত্রেই অকাণ্ড করে বসে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> "যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই, ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তারপরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয় না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীয় পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনিতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়, কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্যদিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়ারও তাদের পক্ষে অসাধ্য।"[৮১]

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে আবেগের মোহে আমরা বিলেতি বিদ্যা মুখস্থ করতেছি, ঐ বিদ্যাকে দেশজ আবহে সম্পৃক্ত করে কখনো আত্মস্থ করতে পারিনি। ফলে এ বিদ্যা আমাদের মানুষ করে না এক একটি সীল মারা বস্তু হয়ে উঠে মাত্র। কবির ভাষায়—

> .....আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরী। ওই বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাশ করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়ো গোছের সীলমোহর। মানুষকে তৈরী করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া বাজার দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।[৮২]

www.pathagar.com

বিষয়বস্তুকে তথা অধিত বিষয়কে আত্মস্থ না করে মুখস্থ বিদ্যাকে রবীন্দ্রনাথ চৌর্যবৃত্তির সাথে তুলনা করেছেন। মুখস্থ করে মগজের ভেতরে রাখাকে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বড়ো চৌর্যবৃত্তি বলেছেন—

> .....মুখস্থ করিয়া পাশ করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে দেশে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে দেখাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়ে ও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল।[৮৩]

শিক্ষা ও শিক্ষার্থীকে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন মাটির কাছাকাছি নিতে। মানুষ, মাটি ও পরিবেশ এবং প্রকৃতিকে একাত্ম করে শিক্ষার আবহ তৈরী করতে। এই জন্যই তিনি বলেছেন—

আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে, ছায়া চাহিতেছে সেখানে কোঠাবাড়িগুলো ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি না কেন? গুরুর চারিদিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা—যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোক সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাকনা কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—'আমরা চাই'। এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন সাধনা করিতেছেন ধ্যান করিতেছেন তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্পে যেমন মেঘে মেলে, মেঘ তেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিসিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্রে মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভুমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?[৮৪]

আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য আরো একটি বড়ো সমস্যা হলো আমাদের ভাষা যেমন পরের তেমনি বিদ্যাটাও আমরা না বুঝেই পরের কাছ থেকে পেয়ে থাকি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—

> আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানী মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা তাকে সেই টিকিটাকেই ষোলো আনা মানিয়া লইতে হয়। এই জন্যই ইস্কুলমাষ্টার এবং মাসিক পত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার পসার বাড়ে। এতকাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?[৮৫]

দীর্ঘদিন ধরে যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলে আসছে এবং বাঙলা, বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি হতে তাও এড়িয়ে যেতে পারেনি—

> "ইংরেজি সাহিত্যের রসমত্তায় নূতন মাতাল ইংরাজি শিক্ষিত ছাত্রেরা সেদিন বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করেছিল। আবার সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত সংস্কৃত পণ্ডিতেরা মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু বহুকালের উপেক্ষিত ভিখারি মেয়ে যেমন বাহিরের সমস্ত অকিঞ্চনতা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন নিজের অন্তর হতে উন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ গৌরবে বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে আপন আসন অধিকার করে, অনাদৃত বাংলাভাষা তেমনি করে একদিন সহসা কোন্ ভাবাবেগের ঔৎসুক্যে আপন বহুদিনের দীনতার কূল ছাপিয়ে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে উঠল।"[৮৬]

আমাদের ভাষা নিধনযজ্ঞ ও বাংলাভাষাকে ইসলামীকরণ এবং বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে চাপিয়ে দেবার যে সমস্যাটা আমরা বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে প্রকট মনে করি তা অনেক আগে থেকেই। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি থেকে তাও এড়িয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

"সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকেই কোণঠেষা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি। চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্বতা ঘটে যদি জবরদস্তি দ্বারা তাহাদিগকে ফার্শি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা হয়, তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলাভাষাতে তাঁহারা মুসলমানি মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরও জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন।"[৮৭]

রবীন্দ্রনাথ একটি সত্য স্পষ্ট করেই বুঝেছিলেন যে,—

> মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানদের সত্য ইচ্ছা।[৮৮]

১৯৩২ সনের আগস্ট মাসে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে রীডারশিপ পদ প্রদান করে। উক্ত পদ গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিদ্যালয়র রূপ' ও 'শিক্ষার বিকিরণ' নামে দু'টি বক্তৃতা দেন। উক্ত বক্তৃতাগুলোতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যতীত দেশের প্রকৃত স্বরাজ ও স্বাধীনতা আসতে পারে না এবং দেশের মানুষও প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। শিক্ষার বিকিরণে তিনি বলেছেন—

> "বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকেন? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা জানি নে' বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয়, 'শুধু কেবল বাংলাভাষা জানি' বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত। যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে।"[৮৯]

বিদেশী ভাষা যে মানুষকে স্বাধীন ও স্বকীয় সত্তায় উদ্দীপ্ত করতে পারে না তাও রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করে বলেছিলেন—

"অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু, বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন।

...বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতো যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশপরা অভিনয় দেখেছি; তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইর স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষায় আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাংলাতে চেষ্টা করেছিলেন, শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।

www.pathagar.com

রচনার সাধনা অমনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারিনে বলে, তুলনা করতে পারিনে।[৯০]

মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় বৈষয়িক কাজ চালানো যেতে পারে কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করতে গেলে জোর করে করতে হয় বলে সেখানে কৃত্রিমতার বহরটার বেশি থাকে।—

> "বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে। রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বৈকি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।[৯১]

শিক্ষা পদ্ধতিতে আমাদের শহরের শিক্ষা ও গ্রামের শিক্ষার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাও উল্লেখ করেন—

"একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উঃকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি : তোমার অভ্রভেদী শিক্ষারচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালি চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।[৯২]

আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার শিক্ষা পদ্ধতির সাথে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির তুলনা করে বলেছেন—

"আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি বলে একটা পদার্থের আবির্ভাব হয়েছে। তারই নামে স্কুল-কলেজে ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাতা তুলে উঠেছে। এমনভাবে একটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছায়—সূর্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তার চারদিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তঃপুরিকা বধুর মতোই ভীরু। আঙিনা পর্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষাই যোগ্য—অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখবার সুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসংঘকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চিরশিশুর মতোই গণ্য করা হয়েছে। তারা কোনোমতেই পুরো মানুষ হয়ে উঠবে না, অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পুরো মানুষের অধিকার লাভ করবে, চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি। জ্ঞানলাভের ভাগ দিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এত বড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই—জাপানে নেই, পারস্যে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে আদিম পাপ। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃভাষাগত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেছি। ইংরেজি হোটেলওয়ালার দোকানছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবে না এমনকথা বলাও যা, আর ইংরেজি ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক্ সাধনা হতেই পারবে না বলা এও তাই।

www.pathagar.com

এই উপলক্ষে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানি ভাষায় সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য করে তবে জাপনি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে—ভদ্রলোক বলে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝে নি। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছুই দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল, অথচ দেশের অন্তত, বারো-আনা অনালোকিত। ভদ্রমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না, বিশ্ব সমাজের তো কথাই নেই।

রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই কিছু বলি না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে বলেই কর্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোট করে রেখেছি। মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত, তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অংশে বুদ্ধি বিদ্যার, ধন মান সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রে ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।[৯৩]

রাশিয়ার অনেক কড়াকড়িকে স্বীকার করেও প্রশংসা করেছেন যে, শিক্ষার আলোকে অন্ত পক্ষে তারা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন এবং এখানে ধনী নির্ধনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষাটা যেনো উচ্চবিত্তের জন্য শুধু। তাই কবি বলেছেন।—

"আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয়, আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলেই চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সবচেয়ে পর হয়ে— তার সঙ্গে আমাদর দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি, এর ব্যর্থতা আমাদের স্বজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিদ অতি প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগাত্যাই চেপে রয়েছে; আইন আদালত, সকল প্রকার সরকারি কার্যবিধি, যা বহুকোটি ভারতবাসীর ভাগ চালনা করে, তা সেই বহুলোকটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ, দুর্গম।

....দেশের চিত্তের সঙ্গে এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পত দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে, কেননা নিশ্চিত জানি সকর পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ শিক্ষায় পরধর্ম। এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেচি, আবার তার পুনরুক্তি করতে প্রবৃত্ত হলেম, যেখানে ব্যথা সেখানে বারবার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না, কেননা অনেকেই কানে আমার সেই পুরোনো কথা পৌঁছায় নি।

..... সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তেরর ভিন্নতা আরও বেশি প্রবল।[৯৪]

মাতৃভাষার মাধ্যমে যেসব জীবনের পূর্ণতা আসে তেমনি মনুষ্যতের বিকাশ দেশপ্রেমের গভীরতা এবং স্বাদেশিক চেতনাও আসে—

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।

www.pathagar.com

মাতৃভাষায় আমাদের আপন ব্যবহারের অতীত আর একটি বড়ো সার্থকতা আছে। আমার ভাষা যখন আমার নিজের মনোভাবের প্রকৃষ্ট বাহন হয় তখনই অন্য ভাষার মর্মগত ভাবের সঙ্গে আমার সহজ ও সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। আমি যদিচ বাল্যকালে ইস্কুল পালিয়েছি কিন্তু বুড়ো বয়সে সেই ইস্কুল আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। আমি তাই ছেলে পড়িয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীর ছাত্র এসেছে, তার মধ্যে ইংরেজি-শেখা বাঙালি ছেলেও কখনও কখনও আমরা পেয়েছি। আমি দেখেছি, তাদেররই ইংরেজি শেখানো সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। যে-বাঙালির ছেলে বাংলা জানে না, তাকে ইংরেজি শেখাই কী অবলম্বন করে। ভিক্ষুকের সঙ্গে দাতার যে-সম্বন্ধ তা পরস্পরের আন্তরিক মিলনের সম্বন্ধ নয়। ভাষাশিক্ষায় সেইটে যদি ঘটে, অর্থাৎ এক দিকে শূন্য ঝুলি আর একদিকে দানের অন্ন, তা হলে তহাতে করে গ্রহীতাকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু, এই ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপজীবিকাতে কখনও কল্যাণ হয় না। নিজের ভাষা থেকে দাম দিয়ে তার প্রতিদানে অন্য ভাষাকে আয়ত্ত করাই সহজ।

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে তখনই অন্য দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়। যে-নদী আমার গ্রামের কাছ দিয়ে বহমান, তাতে যেমন গ্রামের এপারে ওপারে খেয়া-পারাপার চলে তেমনি আবার তাতে পণ্যদ্রব্য বহন করে বিদেশের সঙ্গে কারবার হতে পারে। কেননা সে বহমান নদীর সঙ্গে অন্যান্য নানা নদীর সম্বন্ধে সচল।[৯৫]

১৯১৯ সালের ৭ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ মুরারি চাঁদ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনার উত্তরে একটি ভাষণ দেন। ভাষণটি 'শান্তি নিকেতন' পত্রিকায় এবং পরবর্তীকালে ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে 'মর্ডান রিভিউ'তে প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষণটির শিরোনাম ছিলো— 'আকাঙ্খা'। প্রবন্ধটির সর্বত্রই তিনি আমাদের শিক্ষার কথাই বলেছেন। ভাষণের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি।

"কোন পাথেয় নিয়ে তোমরা এসেছ? মহৎ আকাঙ্খা। তোমরা বিদ্যালয়ে শিখবে বলে ভর্তি হয়েছ। কি শিখতে হবে ভেবে দেখ। পাখি তার বাপ-মায়ের কাছে কি শেখে? পাখা মেলতে শেখে, উড়তে শেখে। মানুষকেও আকাঙ্খা করতে হয়। পেট ভরাতে হবে। ও শেখাবার জন্য বেশি সাধনার দরকার নেই। কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হতে হবে এই শিক্ষার জন্যে যে অপরিমিত আকাঙ্খার দরকার তাকেই শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রাখবার জন্য মানুষের শিক্ষা।[৯৬]

আজকের যুগে ইউরোপ যে, সমস্ত পৃথিবীর উপর শিক্ষকতার ভার পেয়েছে সে তাঁর গায়ের জোরে নয়—জ্ঞানের জোরে, সৃজনশীল শিক্ষার জোরে। তাদের এই শক্ষা পুঁথির বুলি নয়—জীবনে অনুষঙ্গ এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের শিক্ষা—

> "এই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে ইউরোপ শিক্ষকতা ভার পেয়েছে। কেন পেয়েছে। গায়ের জোরে আর সব হতে পারে কিন্তু গায়ের জোরে গুরু হওয়া যায় না। যে মানুষ গৌরব পায় সেই গুরু হয়। যার আকাঙ্খা বড় সেই ত গৌরব পায়। ইউরোপ বিজ্ঞান ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশি খবর রেখেছে বলেই আজকের কোনো বাধাকে মানতে চায় সার্থকতা হয় না। কিন্তু জ্ঞানের জন্যে আকাঙ্খা প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে আবিস্কার করে, তাকে মানুষের অধিকারে আনবার জন্যে আকাঙ্খা; যাতে মানুষ মরুকে জয় করে ফসল পায়, রোগকে জয় করে স্বাস্থ্য পায়, দূরত্বকে জয় করে নিজের গতিপথ অবারিত করে, তাতে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়। তাতেই প্রমাণ হয় যে, মানুষের জাগ্রত আত্মা পরাভবকে বিশ্বাস করে না; কোন অভাব দুঃখ দুর্গতিকেই সে অদৃষ্টের হাতের চরম মার মনে করে মাথা পেতে নিতে অপমান বোধ করে; সে জানে যে তার দুঃখ মোচন তার নিজেরই হাতে, তার অধিকার প্রভুত্বের অধিকার। য়ুরোপ এমনি করে আকাঙ্ক্ষার 'পাখা' বড় করে তুলতে পেরেছে বলেই

www.pathagar.com

> আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শিক্ষা দেয়ার অধিকার সে পেয়েছে। সেই শিক্ষাকে আমরা যদি পুঁথির বুলি শিক্ষা, কতকগুলো বিষয় শিক্ষা বলে ক্ষুদ্র করে দেখি তাহলে নিজেকে বঞ্চিত করলুম। মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীনে। এই মনুষ্যত্ব হচ্ছে আকাঙ্ক্ষার ঔদার্য, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়, মহৎ সঙ্কল্পের দুর্জয়তা।[৯৭]

ইউরোপের ছাত্র-ছাত্রীরা যেন বিদ্যা অর্জন করছে করছে তা শুধু পুঁথির পাতা থেকে নয় দেশের মাটি থেকে। তাদের বিদ্যা তাদেরই সাধনার ধন। মনুষ্যত্বের বিকাশকেই তারা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করে।

"ইউরোপের লোকালয়ে ইউরোপের মানুষ বিপুল আকাঙ্ক্ষাকে নিয়তই নানাক্ষেত্রে প্রকাশ করছে এবং জয়ী করছে, সেই দেশব্যাপী মহৎ উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা, তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং তাদের জীবনের শিক্ষা পাশাপাশি সংলগ্ন। এমনকি যে বিদ্যা শিক্ষকদের হাত থেকে গ্রহণ করছে সে বিদ্যা তাদের আপন দেশেরই সাধনার ধন, তার মধ্যে শুধু ছাপার অক্ষর নেই। তারে আপন দেশের লোকের কঠিন তাপস্যা আছে। এই কারণে সেখানকার ছাত্র শুধু যে কেবল শিক্ষার বিষয়কে বইয়ের পাতায় দেখছে, আর গ্রহণ করছে তা নয়, মানবতার কর্তৃত্ব তার দাসত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব চারদিকেই দেখেছে। এতেই মানুষ আপনাকে চেনে এবং মানুষ হতে শেখে।[৯৮]

যে দেশের বিদ্যা শুধু পুঁথির পাতায়, মুখস্থ বুলিতে, সে বিদ্যা আবর্জনা স্বরূপ মানুষকে ও শেষে পেছনেই টানে। এখানে সচল প্রাণ নেই, আত্মার গতি নেই—মনের মুক্তি নেই।—

> "যে দেশে বিদ্যালয়ে কেবল দেখতে পাই, ছাত্র নোট বুকের পত্রপুট মেলে ধরে বিদ্যার মুষ্টিভিক্ষা করছে, কিংবা পরীক্ষায় পাশের দিকে তাকিয়ে টেক্সট বইয়ের পাতায় পাতায় বিদ্যার উচ্ছবৃত্তিকে নিযুক্ত, যে দেশে মানুষের বড় প্রয়োজনের সামগ্রী মাত্রেই পরের কাছে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করা হচ্ছে, নিজের হাতে লোকে দেশকে কিছুই দিচ্ছে না—না স্বাস্থ্য, না অন্ন, না জ্ঞান, না শক্তি, যে দেশের কর্মের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কর্মের চেষ্টা করছে না, যে দেশের প্রশ্ন করা, বিচার করা, নতুন করে চিন্তা করা ও সেই চিন্তা ব্যবহারের প্রয়োগ করা কেবল যে নেই তা নয় সেটা নিষিদ্ধ এবং নিন্দনীয়, সেই দেশে মানুষ আপন সমাজে সত্যকে দেখতে পায় না, কেবল হাতের হাতকড়া পায়ের বেড়ি এবং মৃত যুগের আবর্জনা রাশিকেই চারদিকে দেখতে পায়; জড় বিধিকেই দেখে, জাগ্রত বিধাতাকে দেখে না।"[৯৯]

আমাদের যে শিক্ষা তা দিন দিন আমাদের সংকীর্ণ বৃত্তে টেনে আনছে। এই শিক্ষা মুক্তি দিচ্ছে না সাগর পানে, বিশ্বের পানে নিয়ে যাচ্ছে না তাই এ শিক্ষায় আমাদের মন-মানস ও আত্মার বিকাশ ঘটছে না—

> "অতএব প্রকৃত শিক্ষা জ্ঞান-সমুদ্রের যে বন্দরে নিয়ে যায়, সে বন্দর কোথায় যেখানে এই উপদেশের সার্থকতা আছে, 'আত্মানাং বিদ্ধি; 'ভূমৈর বিজিজ্ঞাসিতব'? মানুষ সেখানে সুমহৎকে পায় অর্থাৎ মানুষ সেখানে সেই ত্যাগের শক্তি পায় যে ত্যাগের দ্বারা সে সৃষ্টি করে; যে শক্তির দ্বারা সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে। কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষ বিদ্যাসমুদ্রে এই যে মহাভিড় করা খেয়ায় পাড়ি দিচ্ছে সামনের কোন বন্দর সে দেখতে পাচ্ছে বলত? দারোগাগিরি, কোরানীগিরি, ডেপুটিগিরি। এইটুকু মাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এত বড় সম্পদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এর লজ্জাটা এত বড় দেশ থেকে একবারে চলে গেছে। এরা বড় করে চাইতেও শিখলে না? অন্য দারিদ্রের লজ্জা নেই, আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্যের মতো লজ্জার কথা মানুষের পক্ষে আর কিছুই নেই। কেননা অন্য দারিদ্র্য বাইরের এই আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র আত্মার।"[১০০]

আমাদের শিক্ষায় মহৎ হবার, বৃহৎ হবার, নিজকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার ও ব্যাপক হবার আকাঙ্ক্ষা নেই। সংকীর্ণতা ও হীনমন্যতা—সর্বদাই আমাদের আত্মাকে আবৃত করে রাখে। তাই কবির বক্তব্য—

www.pathagar.com

"আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে ছোটকাল থেকেই কোমর বেঁধে আমরা খর্ব করি। অর্থাৎ সেটাকে কাজে খাটাবার আগেই তাকে খাটো করে দিই। অনেক সময়ে বড় বয়সে সংসারের ঝড় ঝাপটের মধ্যে পড়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষার পাখা জীর্ণ হয়ে যায়; তখন আমাদের বিষয়বুদ্ধি অর্থাৎ ছোট বুদ্ধিটা বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, শিশুকাল থেকেই আমরা বড় রাস্তায় চলবার পাথেয় ভার হালকা করে দিই। নিজর বিদ্যালয়ে ছোট ছোট বালকের মধ্যেই সেটা আমি অনুভব করে। প্রথমে কয় বৎসর এক রকম বেশ চলে কিন্তু ছেলেরা যেই থার্ড ক্লাসে গিয়ে পৌছায় অমনি বিদ্যা অর্জন সম্বন্ধে তাদের বিষয়বুদ্ধি জেগে ওঠে। অমনি তারা হিসাব করে শিখতে বসে। এখন থেকে তারা বলতে আরম্ভ করে আমরা শিখব না, আমরা পাস করব। অর্থাৎ যে পথে যথাসম্ভব কম জেনে যতদূর সম্ভব বেশি মার্ক পাওয়া যায় আমরা সেই পথে চলবো।"[১০১]

চিরকালটাই আমরা শিক্ষায় ফাঁকি দিয়ে আসছি। দারোগা হবো, কেরাণী হবো, অর্থ উপার্জন করবো—ক্ষমতা দেখাবো। কিন্তু দেশের কাছে মাটির কাছে মানুষের কাছে যে ঋণ—এর শোধ করার কথা কখনো ভাবিনি—। বিশ্বের কাছে দিন দিন আমরা অবনত হয়ে বললাম, ভিক্ষা গ্রহণের জন্য হাত বাড়িয়েই রাখলাম।

"এই ত দেখছি শিশুকাল থেকেই ফাঁকি দেবার বুদ্ধি অবলম্বন। যে জ্ঞান আমাদের সত্যের দিকে নিয়ে যায়, গোড়া থেকেই সেই জ্ঞানের সঙ্গে অসত্য ব্যবহার। এর কি অভিশাপ আমাদের দেশের ওপর লাগছে না? এই জন্যেই কি জ্ঞানের সঙ্গে আমরা ভিক্ষার ঝুলি হাতে বাইরে বসে নেই? আপিসে বড় বাবু হয়েই কি আমাদের এই অপমান ঘুচবে? আজরেক দিনে দেশের লোকেরা-যুবকেরা পর্যন্ত বলছে যে, ঋষিরা যা করে গছেন তার ওপর আমাদের কিছুই ভাবার নেই, কিছুই করবার নেই; এর মানে বুঝতে পেরেছ? এইটেই ঘটেছে আমাদের কর্তৃক প্রবঞ্চিত বিদ্যাসমিতির অভিশাপে। যে সমাজে কিছুই ভাবার নেই, কিছুই করবার নেই, সমস্তই ধরাবাঁধা সে সমাজ কি বুদ্ধিমান শক্তিমান মানুষের বাসের যোগ্য? সে সমাজ তা মৌমাছির চাক বাঁধবার জায়গা। দশ-পনের বছর ধরে শিক্ষালাভ করে আপন চিত্তশক্তির পক্ষে এমন অদ্ভুত অপমানকর কথা অন্য কোন দেশে এতগুলো লোক এত বড় নির্লজ্জ অহঙ্কারের সঙ্গে বলতে পারেনি। সকল বড় দেশে যে বড় আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আপন শক্তিতে আপন ভাবনায় আপন হাতেই সৃষ্টি করবারই গৌরব দান করে, আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাকে কেবল যে বিসর্জন করেছি তা নয়—দল বেঁধে লোক ডেকে বিসর্জনের ঢাক পিটিয়ে সেই তালে তাণ্ডব নৃত্য করছি।

"কিন্তু আপন দুর্গতি নিয়ে খুব জোরে অহঙ্কার করলেই যে সেই দুর্গতির বিষ মরে এই আশা যেন না করি। আকাঙ্ক্ষাকে ছোট করবো; সাধনাকে সঙ্কীর্ণ করবো; কেবল অহঙ্কারকেই বড় করে তুলব, এও আপনাকে তেমনি ফাঁকি দেওয়া যেমন ফাঁকি শিক্ষা এড়িয়ে পরীক্ষার মার্কা পেয়ে নিজেকে বিদ্বান মনে করা। যেখানে ফল দেখা যায় সেখানেই চেয়ে দেখি ডিগ্রি পেলুম, চাকরি করলুম , টাকা হল; কিন্তু জ্ঞানের ঋণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে শোধ করতে পারলুম না, সেখানে সমস্ত বিশ্বের কাছে মাথা হেট করে রইলুম। তোমাদের আমি দূর থেকে উপদেশ দিতে আসিনি। স্বদেশের এতদিনকার যে পুঞ্জিভূত লজ্জা, যে-লজ্জাকে আমরা অহঙ্কারের গিল্টি করে গৌরব বলে চালাতে চেষ্টা করেছি সেইটের ছদ্ম পরিচয় ঘুচিয়ে তোমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত কর দেখাতে চাই তোমাদের বয়স কাঁচা, তোমাদের বয়স তাজা, তোমাদের ওপর এই লজ্জা দূর করবার ভাল তোমরা আকাঙ্ক্ষাকে বড় করবে, সাধনাকে সত্য করবে। তোমরা যদি উপরের দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে প্রস্তুত হও তাহলে সকল বড় দেশ যে ব্রত নিয়ে বড় হয়েছে আমরাও সেই ব্রত নেব। কোন ব্রত? দান ব্রত।[১০২]

www.pathagar.com

চার

মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে যে দু'জন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন রবীন্দ্রনাথ অপরজন শেখ মুজিবুর রহমান। এ দু'জনই বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে বিশ্বের দুয়ারে গর্ব ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৩৭ সনের ১১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য এক সবচেয়ে গৌরবময় দিন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। উদ্বোধক কবি রবীন্দ্রনাথ। সিনেট হলে স্থান সংকুলান হবে না বলে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। লোকে লোকারণ্য। রবীন্দনাথ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ বাংলা ভাষায় প্রদান করেন। এর আগে এদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বা কোনো উৎসবেই কেহ বাংলায় ভাষণ প্রদান করেননি। সমাবর্তন উৎসবে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে বলেন—

> "ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেরই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।...সকলের চেয়ে অনর্থকার কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দুরত্ব দান করা।.....দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার করে এসেছি।.....আমাদের দেশে শিক্ষা অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসের মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ।"[১০৩]

ভাষণের শেষে কবি নিচের প্রার্থনা কবিতাটি আবৃত্তি করেন—

হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।
সবলে ধিকৃত করো দীনতার ধুলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধন,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দুর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানমর্যাদা-বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে
নিঃসংকোচে।

রবীন্দ্রনাথের এ ভাষণ সেদিন সরকারি ও বেসরকারি মহলে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলায় ভাষণ এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। এ প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনীতে বলেন—

চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বিংশ অধিবেশন (ফাল্গুন ১৩৪৩) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার ভাষণের এক স্থানে বলেন—"১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাংলার জন্য যোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এফ-এ পরীক্ষায় [Entrance ও First Arts নাম তখন ছিল, Matricaulation ও Intermediate in Arts. I.A.-এ স্থলে] যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাংলার বাহনে বিতরিত হয়—তজ্জন্য স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া (আমিও কমিটির একজন সদস্য ছিলাম) একটি কমিটি গঠিত করেন। ঐ কমিটি সসংকোচে প্রস্তাব করেন—'The the University be moved to adopt a regulatuon to the effect that in History, Geography and Mathematics

www.pathagar.com

at the Entrance examination, the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate'। ঐ প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলে বিবেচনানার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল.....সিনেট এইরূপ বিধান করেন যে, 'An optional examination be held in original composition in Bengali and other vernaculars for the F.A. and B.A. candidates" প্রবাসী চৈত্র ১৩৪২, পৃঃ ৯০১-০২।

এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৯১০ পর্যন্ত ছাত্রদিগকে বাংলায় পরীক্ষা দিতে হইত না। থার্ডক্লাস (cass VIII) পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হইত। মেয়েরা বাংলা লইতে পারিত। মনে আছে আমাদের স্কুলে আমাদের উপরের ক্লাসে একটি ছেলে বাংলায় পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়; এই সংবাদ পাইয়া আমাদের ক্লাসে কী হাস্য! সে ছেলেটি যেন অদ্ভুত কিছু করিয়াছে। এই ছিল বাংলার দশা।[১০৪]

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কমিশনের সভাপতি স্যার মাইকেল স্যাডলার রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের শিক্ষা পদ্ধতির উপর অভিমত ব্যক্ত করেন যে,—

> 'It is Sir Rabindranath's conviction that, while English should be skilfully and through as a second language, the chifef medium of instruction in schools (and even in colleges up to the stage of the University degree) should be the mother tongue..... He holds that the essential things in the culture of the west should be conveyed to the wohle Bengali people by menas of a widely diffused education, but that this can only be done through a wider use of the vernacular in the schools"[১০৫]

পরবর্তীকালে স্যাডলার সাহেব আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষা হিসেবে যে সব অভিমত প্রকাশ করেন তা' সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য। তিনিই প্রথম অভিমত প্রদান করেন যে, স্কুল পর্যায়ে গণিত, ইংরেজি ভাষা সাহিত্য ছাড়া আর অন্যান্য বিষয়ই মাতৃ ভাষায় হওয়া উচিত। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি নতুন রেগুলেশন গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনকার সরকার ১৯২৪ সনের ৭ আগস্ট স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদান করে এবং আরো বলা হয় যে, শিক্ষাদান কার্য ও উত্তর পত্র মাতৃভাষায় লেখা বাধ্যতামূলক হলে নানা সমস্যা, অসুবিধা ও আপত্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

অবশেষে ১৮৩২ সনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট একটি নতুন রেগুলিশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ের উত্তরই মাতৃভাষায় দিতে পারবে। ১৯৩৫ সনে সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়। ১৯৪০ সন থেকে এই প্রস্তাব কার্যকর হয় এবং রবীন্দ্রনাথ এতে খুবই আনন্দিত হন।

১৯৪০ সন কোলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে বলেন—

> বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তালাভ গৌরবান্দিত হবে, সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশকরার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হয়নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তারপর কিশোর বয়সে

www.pathagar.com

অভিভাবকদের নির্দেশ মতো একদিন সংকোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বহিরঙ্গ ছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। সেই এক দিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছিল না। আকারে প্রকার সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন কিছু ছন্দের ব্যতায় ছিল যাতে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম মণ্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য দিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকাতা থেকে বিরত হয়েছিলেম এবং আর যে কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারীবর্গেরএক পাশে স্থান পাব এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনাপুণ্যেই আজ সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে, সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।"[১০৬]

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধে অনুবৃত্তিতে কবির এ বক্তব্য আরো স্পষ্ট—। শুধু তাই নয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোও তিন তুলে ধরেন—

"কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিতি মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে-ভাষা দেশের সর্বত্র স্বীকৃত, অন্তপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেই জন্য পালিভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমি যখন বলিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখিলে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্‌বুদ বরিয়া প্রতীত হইবে তাহার এমন অর্থ নহে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কাজ বা অকা করিতেছে না এবং হইবে তাহার এমন অর্থ নহে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কাজ বা অকাজ করিতেছে না এবং ইংরেজি শিক্ষায় লোকদের কোনো উপকার বা অপকার হয় নাই। আমার কথার অর্থ এই ছিল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মূলে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। কার যদি ইংরেজ দেশ হইতে চলিয়া যায় তবে ঐ বড়ো বড়ো সৌধগুলি কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পায় না।"[১০৭]

আমাদের দেশের মুখস্থবিদ পণ্ডিতেরা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার নাম শুনে আতিঙ্কিত হেয় উঠেছিলেন। আসলে তারা যে ভালো ইংরেজি জানতো তা নয়—সাহেবীপনা দেখাবার জন্যই তারা ইংরেজির সমর্থক ছিলেন—

"আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি-জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকার পাচ্ছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঙ্খা ও দরিদ্র।"[১০৮]

মাতৃভাষা বাংলাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার পথ যে কতো কঠিন তা রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই কানতেন। এজন্যই তিনি বলেছেন—

"বাঙালির ছেলে ইংরেজিবিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করবার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে.....।

....আমি যে আজ উদ্‌বেগ প্রকাশ করছি তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভাল এবং বাংলাভাষার পথ এখনো কাঁচাপথ। এই সমস্যা-সমাধান দুরূহ বলে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবীকালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি পরিপূর্ণ

www.pathagar.com

সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা না করে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন করে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজভাবে অর্থাৎ তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে; বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সম্পূর্ণ আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশু যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত নিয়েই দাঁড়ায়। এমন নয়, একটা ঘরে বছর-দুয়েক ধরে ছেলেটির কেবল পা'খানা তৈয়ের হচ্ছে, আর-একটা ঘরে এগিয়েছে যাদের কনুইটা পর্যন্ত। এতদূর অত্যন্ত সতর্কতা সৃষ্টিকর্তার নেই। সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।

তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই, সে মূর্তি কারখানায় তৈরি খণ্ড খণ্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক বিদ্যালয় হতে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।".....

....বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নাভোজী পরাবস্থশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই, এই কঠিন তর্ক তুললে একদা সেটা কথা-কাটাকাটির ঘূর্ণি হাওয়াতেই আবির্তত হতে পারত, দূর দেশ ছাড়া কাছের পাড়া থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে ঐ উৎপাতটাকে শান্ত করা যেতে পারত না। আজ হাতের কাছেই সুযোগ মিলেছে।"[১০৯]

বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন আগে বই লিখে মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রবর্তন নয়—বরং মাতৃভাষার শিক্ষা চালু করলে শিক্ষকেরাই বই তৈরি করেন—

"বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানে বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য বিষয়ের ঘুচতেই পারে না। যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে।

বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিত সমাজে তার কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি স্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা জানি নে' বলতে অগৌরব বোধ করত না এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মথা হেঁট করতে হয়, 'শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলা ভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে।[১১০]

মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষের সমস্ত সত্তা ও প্রাণ প্রবাহের পরিচয় মিলে। বাংলাদেশের জন্মগ্রহণ করলেই বাঙালি হওয়া যায় না—এবং মাতৃভাষাকে হৃদয়লোক ও চিত্তলোকের আলোকে সম্পৃক্ত করে এবং রক্ত প্রবাহের স্পন্দনে একাত্ম করতে পারলে তবেই বাঙালি হওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়; বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি। ভাষা আত্মীয়তার আধার, তা মানুষের জৈব-প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর। আজকাল দিনে মাতৃভাষার গৌরববোধ বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়েছে; কারণ, ভাষার মধ্যে দিয়ে তাদের পরস্পরের পরিচয় সাধন হতে পেরেছে এবং অপরকেও তারা আপনার যথার্থ পরিচয় দান করতে পারছে।

মানুষের প্রকাশের দুই পিঠ আছে। এক পিঠে তার স্বানুভূতি; আর-এক পিঠে অন্য সকলের কাছে আপনাকে জানানো। সে যদি অগোচর হয় তবে সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। যদি নিজের কাছেই তার প্রকাশ ক্ষীণ হল তবে সে অন্যের কাছেও নিজেকে গোচর করতে পারল না। যেখানে তার আগোচরগত সেখানেই সে ক্ষুদ্র হয়ে রইল। আর যেখানে সে আপনাকে প্রকাশ করতে পারল সেখানই তার মহত্ত্ব পরিস্ফুট হল।

www.pathagar.com

এই পরিচয়ের সফলতা লাভ করতে হলে ভাষা সবল ও সতেজ হওয়া চাই। ভাষা যদি অস্বচ্ছ হয়, দরিদ্র হয়, জড়তাগ্রস্থ হয়, তা হলে মনোবিশ্বে মানুষের যে প্রকাশ তা অসম্পূর্ণ হয়।

বাংলাভাষা এক সময়ে গেঁয়ো রকমের ছিল। তার সহযোগ তত্ত্বকথা ও গভীর ভাব প্রকাশ করবার অনেক বাধা ছিল। তাই বাঙালিকে সেদিন সকলে গ্রাম্য বলে জেনেছিল। তাই যাঁরা সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃতি শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্যের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছিলেন তাঁরা বঙ্গভাষায় একান্ত আবদ্ধ চিত্তের সম্মান করতে পারেননি। বাংলার পাঁচালি সাহিত্য ও পয়ারের কথা তাঁদের কাছে নগণ্য ছিল। অনাদরের ফল কী হয়। অনাদৃত মানুষ নিজেকে অনাদরণীয় বলে বিশ্বাস করে, মনে করে, স্বভাবতই সে জ্যোতিহীন। কিন্তু, এ কথাটা আদর্শ তবে তা দিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমঝদারের রাজপথটা পায়নি অন্তত তারা আনাড়ি পাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে বিদ্যা মননের সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের 'পরে লক্ষী প্রসন্ন এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করছে প্রত্যহ; পণ্যের আদান প্রদান চলছে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।"[১১১]

আমি আগেও আলোচনা করেছি যারা ভালো বাংলা জানে তারা ভালো ইংরেজিও জানে। কারণ বাংলাভাষা ভালোভাবে জানার ফলেরই ইংরেজি ভাষাকে সহজে আয়ত্ব করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এজন্যই বলেছেন—

> "যে বাঙালির ছেলে বাংলা জানে না তাকে ইংরেজি শেখাই কী অবলম্বন করে। ভিক্ষুকের সংগে দাতার যে সম্বন্ধ তা পরস্পরের আন্তরিক মিলনের সম্বন্ধ নয়। ভাষা শিক্ষায় সেইটে যদি ঘটে, অর্থাৎ এক ঝুলি আর একদিকে দানের অন্ন তা হলে তাতে করে গ্রহীতাকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু এই ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপজীবিকার কখনও কল্যাণ হয় না। নিজের ভাষা থেকে দাম দিয়ে তার প্রতিদানে অন্য ভাষাকে আয়ত্ব করাই সহজ।"
>
> "ইংরেজি সম্বন্ধে আমাদের বিদেশেত্বের কৈফিয়ত আত্মীয় বা অনাত্মীয়—সমাজে গ্রাহ্য হয় না। একদা বিশ্ববিখ্যাত জার্মান তত্ত্বজ্ঞানী অয়কেনের ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছিলেম। আশা করি এ কথাটা অত্যুক্তি বলে মনে করবেন না যে, ইংরেজি শুনলে আমি বুঝতে পারি সেটা ইংরেজি। কিন্তু অয়কেনের ইংরেজি শুনে আমার ধাঁধা লেগেছিল। এ নিয়ে অয়কেনকে অবজ্ঞা করতে কেউ পারেনি। কিন্তু এই দশা আমার হলে কী হত সে কথা কল্পনা করলেও কর্ণমূল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।
>
> বাবু-ইংলিশ নামে নিরতিশয় অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে, কিন্তু ইংরেজি বাংলা তার চেয়ে বহুগুণে বিকৃত হলেও ওটাকে অনিবার্য বলে মেনে নেই, অবজ্ঞা করতে পারি না। আমাদের কারও ইংরেজিতে ত্রুটি হলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন অসহনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না। সেই হাসির মধ্যে থেকে পরাধীনতারই কলঙ্ক দেখা দেয়া কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা যথোচিত শিক্ষার হিসব থেকে কাটা যায়। তা হোক, অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্তকে যতদিন আমাদের মেনে চলতেই হবে ততদিন ইংরেজি-ভাষায়-পেটাই করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়াই বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না।"[১১২]

www.pathagar.com

ইংরেজি ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো ক্রোধ ছিলো না বরং তিনি শ্রদ্ধাভরে একথাই বলতেন যে, বিশ্ব চৈতন্যকে ধারণ করতে হলে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হলে ইংরেজি জানতেই হবে—

> "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, একে অঙ্গীকার করে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোকে জীবযাত্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনো দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক, অপরিচিত বলে তাকে বাধা দেয় বর্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশমাত্রই জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারগম্য; এই অধিকার মনুষ্যত্বের সহজাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দান-সূত্রে সর্বদেশে সর্বকালের মানুষ এক। সেখানে দান করিবার শক্তি দ্বারাই কড়া পাহারা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডার সর্বমানের ঐক্যের দ্বার অর্গলবিহীন। লক্ষ্মী কৃপণ; কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যাগণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ; কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষভাবে বাংলাদেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, ইউরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করেনি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছে, এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই ভাবের প্রধান সার্থকতা এই দেখেছি যে, অনুকরণের দুর্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে ওঠবার উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে।"[১১৩]

শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে মাতৃভাষার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ অনেক কথাই বলেছেন, আমরা এখানে তার সর্বশেষ উক্তির মাধ্যমে যবনিকা টানছি—

> "আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি বাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজি শিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবুও সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে, দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।"[১১৪]

শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ শুধু মাতৃভাষার গুরুত্বই দেননি—প্রকৃতি এবং পরিবেশের কথাও বলেছেন। আমাদের শিক্ষায় আকাশ নেই, বিশ্ব প্রকৃতি নেই, নদী নেই, প্রন্তর নেই, ফুল নেই, ফল নেই, পাখি নেই, জল-স্থল-সাগর নেই, পাহাড় নেই, পর্বত নেই, জীবন নেই, জগৎ নেই, দেশ নেই, মাটি নেই মানুষ নেই—আছে কারাগার স্বরূপ একটি কক্ষ, আছে কিছু নোট বই আর শিক্ষকের তৈরি করে দেয়া কিছু প্রশ্নোত্তর। এই পরিবেশে মেশিনের ছাপ হতে পারে কিন্তু মানুষ হতে পারে না—মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব নয়—শিক্ষায় বিশ্ব প্রকৃতি, দেশ, মাটি ও মানুষের গভীর সম্পর্কে থাকলে তবেই মানুষ হওয়া সম্ভব হয়ইব নিজেও বলেছেন—

www.pathagar.com

"যেখানে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণ-বাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না, সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গল-কর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, কোনো সংকীর্ণ দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে, সেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যহারের শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত্র স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসায়িষিক্ত হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযগমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিস্ক-সভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সকর আনন্দ-সংগীত এক সুরে বাজিয়া উঠিতেছে, যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ নহে—তাহারা নানাপ্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্ব-গৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রয়কে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালক-বৃদ্ধি সকলেই একাসনের বসিয়া নতশিলে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের ও চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।"[১১৫]

এই কারাগার স্বরূপ শিক্ষা কক্ষ থেকে মুক্ত আলোবাতাসে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসার জন্য কবির বক্তব্য—

"যেমন করিয়া হোক আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে।.....স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না.....তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তারহা সাংঘাতিক।" এই সঙ্গেই অতঃপর তিনি বলেছেন—"আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকে আমরা মানুষকেই চাই, তাহার পরিবর্তে প্রাণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পরিবেন না।"[১১৬]

ছাত্ররাই শুধু শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে এমন নয়—শিক্ষকও ছাত্রকে ভালোবাসবেন—ভাবের আদান প্রদান করবেন, অন্তরের আত্মীয়তা গড়ে তুলবেন রবীন্দ্রনাথ বার বার একথা বলেছেন—

"গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যবশ্যক হইয়া উঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতার না হইলে চলে না।"[১১৭]

দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরেও রবীন্দ্রনাথ এ বক্তব্যের উপরই জোর দেন—

"গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পর-সাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ বলে জেনেছি।.....যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ সাযুজ্য ও

www.pathagar.com

সাদৃশ্য থাক চাই।.....যিনি জাত শিক্ষক, ছেলেদের ডাক শুনলেই তার ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলে যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী' তবে নির্ভয়ে সে তার কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না।"[১১৮]

শিক্ষকেরা নোট আর বই মুখস্থ করিয়ে দেবেন—এ শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ চাননি—তাই তিনি বলেছেন—

"তাঁহারা কতকগুলো বই ও কতকগুলো বিষয় বাঁধিয়া দেন—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়, ইহাকে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা-দেওয়া বলেন, এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়।"

"আবরণ" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্ততঃ হওয়া উচিত এবং সেখানে আমাদেরও অধিকার আছে, এ-কথা পদে-পদে জানানো চাই বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এদেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনও তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনও গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখে শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমন করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া উচিত নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ।...বালক অল্পমাত্র যেটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে; তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়ে বসিবে না, শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে।"[১১৯]

শিক্ষককে নিবেদিত প্রাণ হতে হবে শিক্ষার্থীর জন্য—এবং সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে হবে—এবং তাঁকে পিতামাতার স্থানও দখল করেতে হবে—"গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশকিভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্নেহ-প্রেম ভক্তি দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি। তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারক রস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে।" ছাত্ররা হবে কারাগারে কয়েদি আর শিক্ষক তাদেরে নিয়মের নিগড়ে বন্দি করে রাখার জন্য কারাধ্যক্ষ হবেন তাহলে ছাত্ররা কখনো প্রকৃত শিক্ষা পবে না এবং মানুষও হতে পারবে না—

"গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি একেবারের শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদী যোগেই তিনি পূর্ণ নন। তাঁর প্রথম আরম্ভের লীলাচঞ্চল কলহাস্যমুখর ঝরনার প্রবাহ পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায়নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপনার ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাবার অক্ষর দেখে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াইতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান,

www.pathagar.com

প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে, ছেলেদের আঙিনায় চোপদার না দিয়ে এগোলো সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাই পাকাশাখায় ফুল ফোটাবার, ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে।"[১২০]

আমাদের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি একান্তভাবেই যান্ত্রিক এখানে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে আত্মীয়তা ও ভাবের সম্পর্ক নেই।

"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দেবার কল। মাস্টার এই কারখানার অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘন্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারের মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়। মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।"

"আমরা যাহাকে স্কুলে শিক্ষাবলি তাহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয় মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে; ফোনাগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে।"

বলা হয় বর্তমানে শিক্ষকেরা অর্থের বিনিময়ে বিদ্যাদান করেন, প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের গুরুর আদর্শ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। বর্তমান ছাত্র ও শিক্ষকের যে সম্পর্ক-তা খরিদ্দার ও দোকানদারের সম্পর্ক। আজাকাল শিক্ষক ছাত্রের খোঁজ করেন বিদ্যা বিক্রয়ের আশায়, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের উচিত গুরুকে লাভ করা।

আজ আমাদের দেশে শিক্ষার দুর্গতির মূল্যে রয়েছে শিক্ষকের প্রতি অবহেলা। আজ সমগ্র সমাজকে যেমন শিক্ষকদের প্রতি আপন দাবি উত্থাপন করতে হবে। তেমনি শিক্ষকের প্রতিও সমাজকে আপন কর্তব্য পালন করতে হবে। কারণ শিক্ষককে উপযুক্ত সম্মান না দেখালে, শিক্ষকও আপন কর্তব্য পালন করতে হবে। কারণ শিক্ষককে উপযুক্ত সম্মান না দেখালে, শিক্ষকও আপন কর্তব্য উপযুক্ত ভাবে পালন করতে পারেন না।

"কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাহার হৃদয় মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য তাহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশী তিনি দিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে।"

"এক পক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি না উত্থাপিত হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদবোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।"[১২১]

রবীন্দ্রনাথ এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তা হলো পারিবারিক শিক্ষা ও পারিবারিক পরিবেশ। একটি শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার সমস্ত দায়িত্ব আমরা শুধু শিক্ষকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েই নিশ্চিত হয়ে থাকি কিন্তু পারিবারিক পরিবেশও যে শিশুর শিক্ষার উপযুক্ত করে তুলতে হয় তা আমরা আদৌ মনেই করিনে—। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> "সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারের নয়, পরিবারে মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই দেখতে পাই।.....তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে।...সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহপূর্বক নিজেদের অকৃতার্থ করে আজ বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্ব প্রধান লক্ষ্য হোক, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি।"

এই বিষের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় কবির মতে পরীক্ষা পাসের জন্য পড়া মুখস্থ করা নয়, তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে "মানুষের ইতিহাসে যা কিছু ভালো তার

www.pathagar.com

সঙ্গে আনন্দময় পরিচয় সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করা সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া।"[১২২]

আমাদের দেশে আগে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিলো গুরু সেখানে যন্ত্র ছিলেন না—তিনি ছিলেন সৃজনশীল, সজীব ও প্রাণবন্ত—

"পূর্বে আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পেতেম। দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ,—নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেন না মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তার আপন সাধনার অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তার অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরুক প্রাণচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।"

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "ছাত্রদের পরীক্ষা সম্বন্ধে স্বাধীনতা ছিল, তাহা বর্তমানে কল্পনাতীত। পরীক্ষার স্থানে 'পাহারা' বসানোর রীতি আশ্রমে ছিল না; ছাত্রদের আত্মসম্মানে আঘাত করা অর্থ তাহাদের ব্যক্তি পুরুষকে অপমান করা। ছাত্ররা পরীক্ষা পত্র লইয়া যেখানে সেখানে বসিয়া পরীক্ষা উত্তর লিখিত। নীচের ক্লাসের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উপরের ক্লাসের ছাত্ররা সাইক্লোষ্টাইল করিয়াছে কিন্তু প্রশ্নপত্র 'out' হইয়াছে একথা কখনো শোনা যাইত না।"[১২৩] অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যক্রম একটি বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—। উহা হল ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা, 'মানুষ' তৈরি করা।

আমাদের শিক্ষার সবচেয়ে দুবলতা এখানই যে আমাদের শিক্ষা জাতির প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে ও মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রয়োজনে হয়নি। আমরা যাদের শিক্ষা দিই তারাও জানে না তারা কি শিখছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ভাণ্ডার ঘর যেমন করিয়া আহার্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমন করিয়া নহে।.....যে শিক্ষা বাহিরের উপরকরণ তাহা বোঝাই করয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।" শিক্ষা, (পৃঃ ২২৯)

"এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনা ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে 'রিভার' শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তার নির্ভুল উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনোদিন সে কোনো রিভার দেখিয়াছে কিনা, তখন গঙ্গা যমুনার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল যে, 'না আমি দেখি নাই'। অর্থাৎ এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া পরের ভাষায় শেখা যায় তাহা আপন জিনিস নয়; তাহা বহু দূরবর্তী, তাহা কেবল পুঁথিলোক-ভুক্ত।"[১২৩]

আমাদের যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান হওয়া উচিত, তবে উহা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবলই ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কলকারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়। আমাদের যথার্থ শিক্ষা তাপোবনে-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।"[১২৫]

রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা একটি বিষয়ে পুরোপুরি মিল দেখা যায় যে, তাঁর দু'জনেই পাশ্চাত্য বিদ্যাকে দেশজ আবহে আত্মস্থ করে একে নিজস্ব ও দেশীয় রূপ দেবার প্রয়াসী ছিলেন। আর ভাতরীয় বিদ্যাকে যারা অপরিবর্তনীয় মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ তাদের তীব্র ও কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন—

www.pathagar.com

"আমরা বলি যে পৃথিবীতে আর সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ আর সকল দেশের বিদ্যা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্ম বা শিবের প্রসাদ এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশ বিবর্জিত হইয়া অনন্তকালের উপযোগ্য আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীনে করা চলে না; ইহাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাবহন করিতে হইবে, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না।.....স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধে, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই।"১২৬

শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ কোনো সংকীর্ণতা বিশ্বাস করতেন না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের যা ভালো ও মহৎ তা সবই আত্মস্থ করে গ্রহণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিমত পোষণ করেছেন—

"বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারত-চিড়িগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু, দেশে যে নদী চলিতেছে, কেবল সেই দেশের জলে সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি ইউরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে।.....

"অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে ইউরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।"১২৭

কি মহৎ ও উদার চিত্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতবর্ষ অতীব প্রাচীন দেশ—এখানে বহু জাতি ও বহু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে এই ভারতের মহামাবরের সাগর তীরে। ভারতীয় চিন্তা চেতনা ও দর্শনে এবং ভাষা, সাহিত্য, শিল্প আর শিক্ষা ও সভ্যতায় এদের গভীর প্রভাব রয়েছে, এ প্রভাবকে অস্বীকার করলে মূল শিক্ষাকেই অস্বীকার করা হয়। তিনি বলেছেন—

"আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে।"১২৮

নানা কারণে এবং হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার জন্য বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা বিচ্ছেদের পথ অনুসরণ করেছি, রবীন্দ্রনাথ এই সংকীণতা ও হীনমন্যতাকে আঘাত করে বলেছেন—

"ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিকে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খ্রীষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছি না।".....

"ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য

www.pathagar.com

দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।"[১২৯]

আমাদের শিক্ষা যে নিষ্ফল হয়েছে এর মূল কারণ এর মধ্যে বিজাতীয় বীজ নিহিত রয়েছে— একে আমরা জাতীয়তা বোধের উপর ও দেশের চিত্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারিনি।

"ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভাতবর্ষের বিশ্ব সমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্তেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষা-সাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীদের পূর্ণ পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয়নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।"[১৩০]

বিজাতীয় সংকীর্ণ স্বার্থে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত বলেই আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে একে সংস্কার করলে তবে এতে জীবনের পূর্ণতা আসবে—

> "বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ-লাভ, এবং উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলি সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাদের সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন।"[১৩১]

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদদের সাথে পাঠ্য বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। পাঠ্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলেননি তিনি মনে করতেন পাঠ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধন—

> "নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাহি না। কেন না আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিতভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না!"
>
> "শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষা বিধান হয়; প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাকে বুঝতে পারে।"
>
> "শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম; আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারা শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারা প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।"
>
> "গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।"[১৩২]

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> 'জীবনের যাহা লক্ষ্য, শিক্ষারও লক্ষ্য তাহাই। শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং কী শিখিব, এ দুটি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যতো বড়ো চাল তাহার চেয়ে বেশী দরে না।'[১৩৩]

www.pathagar.com

"নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সবল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে।"

"জ্ঞান শিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।"

অথবা,—

"প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে।"

অথবা,—

"শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে একসুরে। সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না।"[১৩৪]

ছাত্রদের মানসিক বিকাশ ঘটবে না—শিক্ষা দ্বারা হৃদয়ের আশাকে পূর্ণ করা যাবে না—মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে না অথচ বছরের পর বছর শিক্ষার্থী শ্রেণী ডিঙিয়ে যাবে—এক গাদা সনদপত্র লাভ করবে একে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলতে নারাজ—

"আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া উঠে।.... কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সকলের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই, প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে।"

"তুমি কেরাণীর চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছে তাহা হাউইয়ের মতো কোনক্রমে স্কুল মাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সন ভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে—এ মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশের সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা।.....এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না। আমাদের ইস্কুলেও এই শিক্ষা নাই।"[১৩৫]

প্রকৃত শিক্ষার অর্থ মানুষকে মুক্তিদান—। সমগ্র জীবন তিনি এই মুক্তির কথাই বলেছেন—

> —"সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহা সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল।" (শিক্ষা, পৃ. ৭৮)
>
> "উপনিষদ বলেছেন—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। অর্থাৎ বিদ্যা মানুষকে মুক্তিদান করে। এই বিদ্যার জোরেই মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে কাজ করতে সক্ষম হয়। প্রকৃত বিদ্যা মানুষকে রোগের ভয়, মৃত্যুর ভয়, দুর্ভিক্ষের ভয়, অত্যাচারীর অত্যাচারের ভয়, কুসংস্কারের ভয় প্রভৃতি বিবিধ ভয় থেকে মুক্তি দিয়ে প্রকৃত স্বরাজ প্রদান করে এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন শক্তিমান মানুষে পরিণত করে। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনের দাসত্ব মোচন করে।"[১৩৬]

কেবল পাণ্ডিত্যচর্চা আর পুঁথি মুখস্থ করাই শিক্ষার নয়—আত্ম প্রত্যয়ী হওয়া, সব পারি, সব পারবো এই ইচ্ছা শক্তি এবং পৌরুষ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হওয়াই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

"আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষা সাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে।.....সকল অবস্থার জন্য নিজেকে

www.pathagar.com

নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধন করায়; অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়, চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মঠ করায় শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।"[১৩৭]

একদিন শিক্ষার একটি বড়ো অর্থ ছিলো সংস্কৃতি চর্চা, আজকের শিক্ষা থেকে এ সংস্কৃতি চর্চাও বাদ পড়েছে—ফলে শিক্ষার্থীর সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে না—সে অমায়িক, বিনম্র ও পরিশীলিত হয় না—

> ".....আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে।"[১৩৮]

শিক্ষার সাথে এই সংস্কৃতি চর্চার জন্যই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মতে—

> "এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলাম। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে শান্তি নিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে! আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষালাভ করবে। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে।"[১৩৯]

তিনি আরো বলেছেন—

> "শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবন যাত্রার নিকট অঙ্গ।.....সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না।....আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতি নিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহ মনে শিক্ষা বিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার।"[১৪০]

আমি আগেই বলেছি পুঁথি পড়া আর পুঁথি মুখস্থ করাকে তিনি জ্ঞানার্জন বলেননি—

> "আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা সমস্ত পুঁথির শিক্ষা।....আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়, বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়।.....বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধ সংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে তখনি তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার চাপিয়া বসিবে না; শিক্ষার উপরে সেই চাপিয়া বসিবে।"[১৪১]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করে আভাস দিয়েছি যে, বাইরের বিদ্যার প্রতি তাঁর কোনো অনীহা ছিলো না—কিন্তু বাইরের বিদ্যাকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই করে অন্তরে যোগ স্থাপন করার কথা বলেছেন এবং একে দেশের জীবন যাত্রার সাথে একাত্ম করে নিতে বলেছেন। তার বক্তব্য 'সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে পারে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে!'

পাঁচ

১৯৩০ সনে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণে যান। সেখানে পৌঁছেই তিনি চিঠি লিখেন—

> 'আপাততঃ রাশিয়ার এসেছি। না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো।'

রাশিয়ার সৃজনশীল এবং জীবনমুখী ও বাস্তব শিক্ষা পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলো তাই তিনি বলেছেন—

www.pathagar.com

"শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোন মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এ জন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে। সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এই জন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।"

জাতির শিকড় আর জীবনী রসের সাথে যে শিক্ষা জড়িত সে শিক্ষাই মানুষকে স্বাধীন করে তুলে। জীবনী রসহীন কৃত্রিম শিক্ষা কখনো মানুষকে স্বাধীন করে তুলতে পারে না। এ শিক্ষা বরং জাতির মেরুদণ্ডকে পঙ্গু করে দেয়। কিন্তু রাশিয়ার শিক্ষা যে মানুষের জীবনের সাথে কতো গভীরভাবে জড়িত একথা বলতে গিয়ে কবি বলেন 'মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ। কারণ 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' আর কোনো উপকারের জন্য জায়গা রাখলো না, তহবিল একবারে ফাঁকা।" কবি সেদিন বৃটিশ সরকারকে কেন্দ্র করে এসব কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরও যখন আমরা শিক্ষার কোনো বাস্তব রূপ পেলাম না, তখন কি আমাদের সরকারের প্রতিও আজ কবির এ কথাগুলো প্রযোজ্য নয়? রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো কৃত্রিমতা নেই। সেখানকার শিক্ষায় জীবন ও আত্মার মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, মানবাত্মাকে নেয়া হচ্ছে স্বাধীন লোকে। তাই সে দেশের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানে পরিপুষ্ট। ফলে পড়াশুনাকে তারা ভয় করে না। বরং জ্ঞানের রস আকণ্ঠ পান করে নব নব সৃষ্টি ও আবিষ্কারের নেশায় তারা মত্ত। আমাদের এ হেন শিক্ষা ব্যবস্থা আর রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তাই যখন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে তখন মনে মনে ঠিক করলুম ভাঙ্গা শরীর আরো যদি ভাঙ্গে তো ভাঙুক ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটি মাত্র উপায় শিক্ষা। অন্ন স্বাস্থ্যে শান্তি সমস্তই এরই পরে নির্ভর করে। ফাঁকা ল অ্যাণ্ড অর্ডার নিয়ে না ভরে পেট না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।"

কবি এবার সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থাকে আলোচনা করতে গিয়ে ইংরেজ জাতিকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি। আর রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা যে শুধু মস্কো শহরের মধ্যেই আবদ্ধ নয়—উপজাতির মধ্যেও তারা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনেছে, কারণ তারা জানে যে সমস্ত শরীরের রক্ত মুখে উঠলে যেমন স্বাস্থ্যবান বলা যায় না তেমনই শুধু মস্কো শহরকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করলেই গোটা রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন আসবে না। তাই কবি বলেন, "রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এত বড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো বৃটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনায় অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত যে করে তোলা সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারিনি। কেননা শিশুকাল থেকে আমরা যে ল অ্যাণ্ড অর্ডারের আবহাওয়ায় মানুষ সেখানে এর কাছে পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখিনি।"

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষার কোনো জাতি বা ধর্ম বিচার নেই! সেখানে তারা কোন ধর্ম বা বর্ণের প্রতিভু করে গড়ে তুলে না শিক্ষার্থীকে। তারা গড়ে তুলে মানুষ, যে মানুষ হবে বিশ্বের মানুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ। কারণ তারা জানে রাষ্ট্রের একটি মানুষকে পিছিয়ে রাখা মানেই রাষ্ট্রের একটি অংশকে পিছিয়ে রাখা। তাই তারা রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষকে মানুষ করে তুলছে—তুলছে শিক্ষিত করে। এ দৃশ্য দেখে কবি বলেন—"চোখে দেখলুম, এও দেখতে পেলুম এদের রাষ্ট্র জাতি-বর্ণ বিচার একটুও নেই। সোভিয়েট শাসনের অন্তর্গত বর্বর-প্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের দেশের শিক্ষার আয়োজন ও সরঞ্জাম যত বেশি শিক্ষার উন্নতি এর অনুপাতে মোটেই নেই। রবীন্দ্রনাথ তার 'তোতা কাহিনী'তে আমাদের দেশের এ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আগেই অনেক ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ করেছেন। রাশিয়ার শিক্ষাকে নিয়ে যতো চিন্তা করা হয় শিক্ষার আয়োজনকে নিয়ে

www.pathagar.com

তত ঢাকঢোল পিটান হয় না। অর্থাৎ কাজের চেয়ে আয়োজন বড়ো নয়। কিন্তু তাদের আয়োজনের চেয়ে কাজ বড়ো। তাই রাশিয়ায় যে কি অল্প সময়ে শিক্ষার এ দ্রুত উন্নতি তা দেখে কবি গুরু বলেন, 'আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে গেছে। যারা মূক ছিলো তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরুক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিলো তারা আজ সমাজের অন্ধ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এ প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এক কালের মরা গাঙ্গে শিক্ষার প্লাবন রয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সামনে একটা নতুন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত। সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়'। আমাদের দেশের শিক্ষা একান্তভাবে কৃত্রিম শিক্ষা। তাই প্রতিবছর আমরা হনুমানের মতো লম্ফ দিয়ে প্রাচীর স্বরূপ ক্লাশ ডিঙিয়ে যাই, একটা ঝকঝকে সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্র পাই, কিন্তু আমরা শিক্ষিত হই কতজন আর মানুষই হই কতজন? দেশের মাটি ও দেশের মানুষের সাথে কি আমাদের কোনো সম্বন্ধে আছে। অথচ রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা যে একান্তভাবে মানুষ হওয়ার শিক্ষা, দেশ ও দেশের মাটিকে ভালবাসার শিক্ষা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এখানে এসে দেখলুম ওরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে স্কুলের সীমাকে সারিয়ে রাখেনি। এরা পাশ করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্য শেখায় না। সর্বোতভাবে মানুষ করার জন্য শেখায়।"

রবীন্দ্রনাথ সে দেশের বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে সেখানকার শিক্ষা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের কি ধারণা তা বলতে গিয়ে তিনি সেখানকার স্কুলগুলো পরিদর্শন করে যে ব্যবস্থা দেখেছেন তারই চিত্র তুলে ধরেন, "ঘরে আসতেই ওরা আমার চারদিকে ঘেঁষাঘেঁষি কর বসলো। যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারো কাছে কোনো যত্নের দাবী করতে পারতো না। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচবৃত্তির দ্বারা দিনপাত করতো। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম অনাদরের, অসম্মানের কুয়াশা ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই। তাছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয় যেন সর্বদা তৎপর হয়ে আছে। কোনো কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।"[১৪২]

রাশিয়ার বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা কবি গুরুকে অভিনন্দন জানালে কবি গুরু অভিনন্দের উত্তর স্বরূপ কিছু বললে একটি ছেলে এর জবাবে যা বলে তা ভেবে আমাদের অবাক হতে হয় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা কতো উচ্চস্তরের। আমরা এ আলোচনায় পরে আসবো।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের শিক্ষা ও রাশিয়ার শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন—বেণিয়া ইংরেজ আমাদের জন্যে যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছে তা আমলা ও কেরানী তৈরি করে মানুষকে শোষণ করার জন্য এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির জন্য আর রাশিয়া একেবারে গোড়া থেকে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে—

ভেবে দেখো-না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে, অতএব এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে—তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত, এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু এক-শো বছর হয়ে গেল; না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি

www.pathagar.com

কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ার একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনো বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা, যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই: নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই—কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয়, অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর—ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য: এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত বলেই কাজ এমন করে সহজে এগোয়। মাথা গুনতি করে আমাদের দেশের কর্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়, তারা পুরো একখানা মানুষ নয়। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০।[১৪৩]

আমাদের সমাজে যে সংকীর্ণতা, হীনমন্যতা, জাতিভেদ, গোত্রভেদ, ও উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতা—এর মূলে রয়েছে যথার্থ শিক্ষার অভাব। যথার্থ ও জীবন-অনুষঙ্গ শিক্ষার মাধ্যমে যে রাশিয়া সমাজ থেকে এসব দূর করেছে রবীন্দ্রনাথ তাও বলেছেন—

আমরা হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি.....। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি চলত—গেল কী উপায়ে! কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।

তাই এখন শুনলুম, রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে, অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা-অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই' পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।[১৪৪]

আমাদের দেশে সরকার বড়ো বড়ো প্রকল্প ও পরিকল্পনা হাতে নেয়—এগুলোতে অর্থের অপচয় হয় কিন্তু সফলতা আসে না। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার শিক্ষার সার্থকতার সাথে তুলনা করে দেখিয়েছে যে, তাদের শিক্ষা হাতে কলমে ও বাস্তবে আর আমাদের শিক্ষা পুঁথির পাতায় আর না বুঝে মুখস্থ করে মাথায় মগজে—

যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীয়র হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল, এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার' পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।[১৪৫]

অতি অল্পসময়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে রাশিয়া আলাদিনের প্রদীপের মতো কিভাবে সমাজের চেহারা পাল্টিয়ে দিয়েছে এবং সেখানে শিক্ষা পদ্ধতি কিভাবে মানুষকে প্রাণবান করে তুলেছে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

রাশিয়ার গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে! দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তার তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি

www.pathagar.com

জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভারান্তর ঘটতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এক কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন রয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সমানে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত; সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখেনি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নই নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনোদিন জানতে চাইতে শেখেনি—প্রথম থেকেই কেবল বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।[১৪৬]

আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেছি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটি সম্পূর্ণরূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার—সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণত হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়—সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।

রাশিয়া থেকে আমেরিকা যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার শিক্ষা পদ্ধতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন—

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছি, চলেছি আমেরিকার পথে। রাশিয়া যাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কিরকম চলছে আর ওরা তার ফল কিরকম পাচ্ছে সেইটে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত-কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরা কবুল করেছে। সে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর-কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বা হয়—গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি: এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে; জিনিসপত্র কেবলই হারায়, তার পরে খুঁজে পায় না; ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে; নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেছে বলে লাঠি উচিয়ে মারতে যায়; কেবলই বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে; উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই; খিদে পায়, কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না; অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তাঁর কাছে লুপ্ত; অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উর দেওয়া চলে না—তার পরে অবশেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয় 'আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি'—তা হলে সেটা কেমন হয়।

ওরা একদিন ডাইনী বলে নিরপরাধীকে পুড়িয়েছে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেছে, ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেছে, নিজেরই ধর্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব করে রেখেছে, এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার

www.pathagar.com

তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায়। এ-সমস্ত দূর হল কী করে। বাইরেকার কোনো কোর্ট অফ ওয়ার্ড্‌সের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কারসাধনের ভার দেওয়া হয়নি; একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা।[১৪৭]

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন হয়েছে আর এ শিক্ষার জন্য করের ভার বহন করতে হবে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন সর্বরিক্ত চাষীদের। রবীন্দ্রনাথ এ কর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন—একে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করে বলেছেন—

কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান ম'লে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের'পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষাকর চাই বইকি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না। সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই। তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেনসন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না। পাটকলের যে সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনাফার সৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই? যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না।

একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কিছু দিয়েও থাকি—আরো দ্বিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি, কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে, আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছে না এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজনও এক পয়সাও।

সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি, সেজন্যে আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে কেউ কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত-গবর্মেণ্ট এত দিন পরে দু-শো বছরর কলঙ্ক মোচন করতে চান—অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম; গবর্মেণ্টের প্রশ্রয়লালিত দেশবাসী বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করবার জন্যে।

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানো আছে।

অনেক কথা বলবার আছে। এরকম তথ্য সংগ্রহ কর লেখা আমার অভ্যস্ত নয়, কিন্তু না-লেখা আমার অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখব বলে আমার সংকল্প আছে। কতবার মনে হয়েছে আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে। কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্যে নয়, কেবল শিক্ষাসম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।[১৪৮]

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশ

১.	শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী	রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩, পৃ. ৪৯০
২.	আশ্রমের শিক্ষা,	রবীন্দ্র রচনাবলী ২৭, পৃ. ৩২৫
৩.	শিক্ষা ও শিক্ষার লক্ষ্য,	রবীন্দ্র রচনাবলী ১২, পৃ. ২৯০
৩.(ক)	তোতাকাহিনী, লিপিকা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৬, পৃ. ১৩২
৪.	পুলিনবিহারী সেন,	রবীন্দ্রায়ণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০
৫.	বৃত্তাবন্ধ রবীন্দ্রনাথ,	ড. সফিউদ্দিন আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩২
৬.	পুলিনবিহারী সেন,	রবীন্দ্রায়ণ, পৃ. ১২৯
৭.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্ম,	বিশ্বভারতী, পৃ. ১২৯
৮.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লক্ষ্য ও শিক্ষা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৬, পৃ. ৫৭৩
৯.	আহ্বান সঙ্গীত,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২য় খণ্ড, পৃ. ১১৫
১০.	প্রবন্ধটি ১২৯০ সালের কার্তিক মাসে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পৃ. ২৮৯-৯০	
১১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা সংস্কার,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ২৮৯
১২.	শিক্ষার হেরফের,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৫৬০
১৩.	জীবন স্মৃতি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১৭, পৃ. ২৬১
১৪.	সাহিত্য সম্মেলন,	রবীন্দ্র রচনাবলী-৮, পৃ. ৫০২
১৫.	সভাপতির ভাষণ,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩, পৃ. ৪৭১
১৬.	জীবন স্মৃতি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১৭, পৃ. ২৬৮
১৭.	জীবন স্মৃতি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১৭, পৃ. ২৬৮
১৮.	আহ্বান সঙ্গীত,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২, পৃ. ১১৫
১৯.	লাইব্রেরী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-৫, পৃ. ৪৩৯
২০.	সাহিত্য সম্মেলন,	রবীন্দ্র রচনাবলী-৮, পৃ. ৪৯৩
২১.	শিক্ষার বাহন,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৪১৮
২২.	ছাত্র সম্ভাষণ,	রবীন্দ্র রচনাবলী-৩, পৃ. ৫৭৯
২৩.	সাহিত্য সম্মেলন,	রবীন্দ্র রচনাবলী-৮, পৃ. ৫১২
২৪.	শিক্ষার বাহন, পরিচয়,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৪৯৭
২৫.	শিক্ষার বাহন, পরিচয়,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৪৯৭
২৬.	শিক্ষার হেরফের,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ২৭৭
২৭.	শিক্ষার হেরফের,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ২৯০
২৮.	শিক্ষার হেরফের,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ২৯৮
২৯.	শিক্ষার হেরফের,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩১২
৩০.	শিক্ষার হেরফের,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩১৫
৩১.	শিক্ষার হেরফের,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩৪০
৩২.	ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ	রবীন্দ্র রচনাবলী-৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৯-৮০
৩৩.	ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ,	রবীন্দ্র রচনাবলী-৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৯-৮০
৩৪.	বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১
৩৫.	জীবনস্মৃতি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬১
৩৬.	শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ৭০৯
৩৭.	ছেলেবেলা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৬, পৃ. ৫৯৪

www.pathagar.com

৩৮. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৭০৯-৭১০
৩৯. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৭৫৬
৪০. শিক্ষার হেরফের, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৮
৪১. শিক্ষার হেরফের, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮১
৪২. শিক্ষার হেরফের, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮২-৮৩
৪৩. শিক্ষার হেরফের, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৮৬
৪৪. শিক্ষার হেরফের, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৮৬
৪৫. শিক্ষার হেরফের, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭
৪৬. শিক্ষার হেরফের, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৮
৪৭. গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ৬১৮-১৯
৪৮. সাহিত্যের গৌরব, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ৫১৮
৪৯. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯২
৫০. শিক্ষার সংস্কার, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯২
৫১. শিক্ষার সংস্কার, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ২৯৪
৫২. বাংলা জাতীয় সাহত্যি, রবীন্দ্র রচনাবলী-৮, পৃ. ৪১৫
৫৩. ভাষা বিচ্ছেদ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৫৪৭
৫৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের কবিতা, ড. সফিউদ্দিন আহমদ, ৭ম জাতীয় কবিতা উৎসবে মূলপ্রবন্ধ (১৯৯৩), দৈনিক সংবাদ।
৫৫. ভাষা বিচ্ছেদ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৫৪৬-৪৭
৫৬. শিক্ষা সমস্যা, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ২৯৭
৫৭. শিক্ষা সমস্যা, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ২৯৭
৫৮. শিক্ষা সমস্যা, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ২৯৯
৫৯. শিক্ষা সমস্যা, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩০৩
৬০. শিক্ষা সমস্যা, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩০৮
৬১. শিক্ষা সমস্যা, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩১০
৬২. শিক্ষা সমস্যা, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩১২
৬৩. অপর পক্ষের কথা, রবীন্দ্র রচনাবলী-১০, পৃ. ৫৮৩-৮৫
৬৪. ব্রতধারণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-৩, পৃ. ৬২০
৬৫. অবস্থা ও ব্যবস্থা, রবীন্দ্র রচনাবলী-৩, পৃ. ৬০০
৬৬. সাহিত্য সম্মিলন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫০২
৬৭. সাহিত্য সম্মিলন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫০২
৬৮. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫০০
৬৯. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫০১
৭০. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫০৩
৭১. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫০৫
৭২. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫১০
৭৩. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫১২
৭৪. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫১৩
৭৫. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫১৬
৭৬. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫১৮
৭৭. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫০৪

www.pathagar.com

৭৮. বিজ্ঞান সভা, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৫১৯
৭৯. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৫০২
৮০. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৫০৪
৮১. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৫০৫
৮২. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৫১০
৮৩. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৫০৭
৮৪. শিক্ষার বাহন, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৫১২
৮৫. বিদ্যা যাচাই, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩৬০
৮৬. সভাপতির অভিভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ২৩
৮৭. সাহিত্য সম্মিলন, রবীন্দ্র রচনাবলী-৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৫
৮৮. হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৪৭৬
৮৯. শিক্ষার বিকিরণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৩০৮
৯০. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৬, পৃ. ৩১৮
৯১. বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩, পৃ. ৩৯২
৯২. শিক্ষার বিকিরণ, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৩, পৃ. ৩৯০
৯৩. রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী-২০, পৃ. ২৮৩
৯৪. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬, পৃ. ৩২২
৯৫. সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩, পৃ. ৪৭৩
৯৬(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাঙ্ক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৯১৯
৯৭(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাঙ্ক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৯১৯
৯৮(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাঙ্ক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৯১৯
৯৯(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাঙ্ক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৯১৯
১০০(ঙ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাঙ্ক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৯১৯
১০১(চ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাঙ্ক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৯১৯
১০২(ছ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আকাঙ্ক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৯১৯
১০৩. ছাত্রভাষণ, শিক্ষা, পৃ. ২৫০-২৬০
১০৪. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৮
১০৫. (Calcutta University Commission 1917-19. Report, Vol. 1 : (226-28)
১০৬. ছাত্র সম্ভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৬৩০
১০৭. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৫০৩
১০৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৫৪০
১০৯. শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৪০৩
১১০. শিক্ষার বিকিরণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩, পৃ. ৪১৮
১১১. শিক্ষার বিকিরণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৩, পৃ. ৪১৬
১১২. সভাপতির অভিভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-৩, পৃ. ৩৯১
১১৩. ছাত্র সম্ভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-১৮, পৃ. ৫৭৯
১১৪. ছাত্র সম্ভাষণ, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৬, পৃ. ৫৭০
১১৫. ধর্মশিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৬, পৃ. ৩৭২
১১৬. শিক্ষা বিধি, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৫৬৭
১১৭. শিক্ষা বিধি, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৫৭০
১১৮. আশ্রমের শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৪০

www.pathagar.com

১১৯.	আবরণ,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩১১
১২০.	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩১
১২১.	শিক্ষা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩০১
১২২.	শিক্ষা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩১৫
১২৩.	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,	রবীন্দ্র জীবনী, পৃ. ৩৯০
১২৪.	শিক্ষা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩১৮
১২৫.	শিক্ষা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩৪০
১২৬.	শিক্ষা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩১৭
১২৭.	শিক্ষা,	রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩১৬
১২৮.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৪৪
১২৯.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৪৬
১৩০.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৪৮
১৩১.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৫২
১৩২.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৫৬
১৩৩.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৫৮
১৩৪.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৬৫
১৩৫.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৬৭
১৩৬.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৭২
১৩৭.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৭৭
১৩৮.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৭৯
১৩৯.	বিশ্বভারতী,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৩৮২
১৪০.	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৪২৫
১৪১.	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২৭, পৃ. ৪৩১
১৪২.	রাশিয়ার চিঠি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২০, পৃ. ২৭৩
১৪৩.	রাশিয়ার চিঠি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২০, পৃ. ২৭৪
১৪৪.	রাশিয়ার চিঠি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২০, পৃ. ২৮৫
১৪৫.	রাশিয়ার চিঠি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২০, পৃ. ২৮৬
১৪৬.	রাশিয়ার চিঠি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২০, পৃ. ২৯৭
১৪৭.	রাশিয়ার চিঠি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২০, পৃ. ৩০৪
১৪৮.	রাশিয়ার চিঠি,	রবীন্দ্র রচনাবলী-২০, পৃ. ৩১৪

www.pathagar.com

শিক্ষানীতির রূপরেখা : তৃতীয় পর্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্মোহক নাম। এ শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম নয়—এ যেনো আমাদের প্রাণের স্পন্দন, আত্মার ধ্বনি এবং অস্তিত্বের উজ্জ্বল উচ্চারণ। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বাঙালির জাতিসত্তা ও অস্তিত্ব, ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা এবং সংগ্রামও স্বাধীনতার প্রতীক। একটি মহাকাব্যে যেমন একটি সমগ্র জাতির আত্মার স্পন্দন অনুভূত হয়—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমনি সমগ্র বাঙালি জাতির আত্মার স্পন্দন অনুভূত হয়।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতি গবেষক শিক্ষা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক গবেষণা ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সমগ্র বিশ্বেই তাঁরা নন্দিত। তাঁরা প্রমিথিউসের মতোই আলো জ্বেলেছে এবং বাংলার বাণীকে করেছে বিশ্বের বাণী।

এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি উজ্জ্বল ও ভাস্বর নাম। এক কথায় বলা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানেই আজকের বাংলাদেশ।

একথা অবশ্যি অস্বীকার করা যাবে না যে, একটি মহিমান্বিত অতীত ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে ভাস্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতেই। বাংলাদেশের সবগুলো আন্দোলনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাড়া না পেলে কোনো আন্দোলনই সার্থক হয় না। আমরা একথাও ভুলে যাব না যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথেও একটি রাজনৈতিক পটভূমি কাজ করেছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আবহ ও উত্তাপ নিয়েই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ সূচনা। এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন এক আলোড়িত ঘটনা। ডিরোজিও শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলদের বাদ দিলে এমনভাবে আমাদের চিন্তা-চেতনায় আর কোন আন্দোলনই নাড়া দিতে পারে নি।

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন যা আমাদের চিত্তজাগরণ ও আত্মজাগরণের রেনেসাঁ, যে আন্দোলনে খুঁজে পাই আমাদের আত্মপরিচয় এবং যা দিয়েছে আমাদের শিকড়ের সন্ধান, স্বরূপের সন্ধান ও উৎসের সন্ধান তাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই লালিত ফসল।

১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা বিভাগের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মেলা', ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সাল মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের স্বাধীনতা এবং ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ভাস্বর। প্রকাশনা এবং গবেষণায়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সমৃদ্ধ।

দেশে বিদেশে নন্দিত অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত, গবেষক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। এখানে আমরা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি।

সত্যেন বোস
আর. সি. মজুমদার
যদুনাথ সরকার
কাজী মোতাহার হোসেন
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
হরিদাস ভট্টাচার্য্য
নলিনীকান্ত ভট্টাশালী
হাসান দানী

www.pathagar.com

মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ
মুহম্মদ আব্দুল হাই
গোবিন্দ চন্দ্র দেব
মুনীর চৌধুরী

এদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হয়। এই ঘোষণার পর পরই বাংলা, বিহার ও আসাম এই তিনটি পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১ এপ্রিল ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রদেশের কার্যাবলী শুরু হবে। এই ঘোষণার সাথে সাথেই হঠাৎ করে বড় লাট লউ হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আগমন করলেন।

লউ হার্ডিঞ্জ ঢাকায় এলে মুসলিম লীগ ও প্রভিন্সিয়াল মহামেডান এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি তাঁর কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করে। আবেদনপত্রে বলা হয়—

> Many imporvement have taken place in this city and throughout Eastern Bengal and Assamduring the past six years and it is our confident hope that under the administration now being organised those benifits will be continued.[১]

ঠিক এমনি সময়ে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রবল দাবি উত্থাপিত হয়। এ দাবির প্রবল চাপে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন ভারত সরকার। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এক ইসতেহারের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হলেও এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। অনেকে মানসিক সংকীর্ণতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে অভিহিত করেছিলো। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯২১ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান ছাত্রের শতকরা হার ছিলো যথাক্রমে ১৫.২%, ৩২.৮%, ৪৪.১%, ৫২.৩%। মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যাও খুবই কম ছিলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজে শিক্ষার এক নবচেতনার সঞ্চার করে। এবং একে কেন্দ্র করেই একদল প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক চেতনাসম্পন্ন সাহিত্যিক, শিল্পী ও চিন্তাবিদের উদ্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও 'শিখা' পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ বিষয়ে আমরা দু'জন বরেণ্য ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদের উক্তির আশ্রয় নেবো।

> মুসলমানেরা বিশেষত পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় খুব ন্যায্য ও সঙ্গত কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমর্থন করিত। কারণস্বরূপ একথা বলা যাইতে পারে—যেমন হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুদের এবং আলীগড় কলেজ ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যেরূপ উন্নতি করেন, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঠিক সেই রূপই উন্নতি সাধন করিয়াছেন।[২]

তবে এখানে রমেশবাবুর উক্তির কোনো কটাক্ষ না করেও বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু বা মুসলমানের বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের কোনো আবহ আজও সৃষ্টি হয় নি। সৃষ্টির প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এবার ড. মাহমুদ হাসানের বক্তব্য—

> By virtue ot the fact that an increasing number of Muslim students were getting educated here, that this small city and this small University had enough residential accomodation

www.pathagar.com

for a large number of Muslim students and that this University started getting representation in the Bengal legistalive assemble, this institution became the monitor of new Muslim Conciousness, a producer of Muslim leader in political economic literary field fields and the shoper of Muslim thougts and ideals.[৩]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম লগ্নেই মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা ছিলো অতীব নগণ্য অল্প কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও আধুনিক চিন্তা-চেতনা, অসাম্প্রদায়িক মানবিকতাবোধ, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোপরি প্রগতিশীল মানসিকতায় তাঁরা একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই শিক্ষকদের উল্লেখ করা যায় ইতিহাস বিভাগের আহমদ ফজলুর রহমান (স্যার এফ. রহমান), অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগে আবুল হুসেন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কাজী মোতাহার হোসেন, ইংরেজি বিভাগে মাহমুদ হাসান, বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলামি স্টাডিজ বিভাগে শামসুল ওলামা আবু নসর মুহম্মদ ওহীদ, ফারসি বিভাগে ফিদা আলী খান, আরবি বিভাগে সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন। এঁরা সকলেই ছিলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রাণপুরুষ।

আমরা প্রত্যয়ভরে নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে এবং বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে একটি নবযুগের সঞ্চার করে। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার পরিসংখ্যানটি তুলে ধরলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

বৎসর	এমএ	বিএ (অনার্স)	বিএ (পাশ)	বিএল	এফএ/আইএ	এন্ট্রান্স
১৮৮৫	১	১	৯	৩	১২	৪৪
১৮৮৬	২	১৩	২৬	৯	——	——
১৮৮৭	৩	১১	২১	৪	৩১	৫১
১৮৮৮	২	৫	১৬	৬	১৯	১১৩
১৮৮৯	৩	৭	২৩	৩	——	৫৪
১৮৯০	২	৬	২২	৮	৫৭	১২৫
১৮৯১	২	৬	১২	১২	১৬	১১০
১৮৯২	৪	৭	১৫	৮	৪৭	৮৫
১৮৯৩	——	৬	২৪	৩	৩৫	১৭২
১৮৯৪	৪	৮	২৭	৩	৩১	১৩৪
১৮৯৫	৪	৫	২৩	২	৫৯	১৫৩
১৮৯৬	২	৫	২১	১৫	৫৩	১৪১
১৮৯৭	৩	৪	১২	১২	৫২	২৪১
১৮৯৯	৩	৮	২২	৬	৬৬	১৭৮
১৮৯৯	৩	৮	২৮	৭	৬৮	২০৩
১৯৯০	৫	৯	৩১	৬	৫৯	২৫৩
১৯০১	৩	৬	২১	৮	৫২	২০৯
১৯০২	৩	৪	২৩	১০	৭৯	২৫৮
১৯০৩	৫	৪	২১	৬	৬৫	১৭৬
১৯০৪	৫	৬	১৬	১৬	৭০	১৩৩
১৯০৫	২	৬	২৮	৭	৪৬	১৮০

www.pathagar.com

ইংরেজ আমলের শিক্ষা পরিকল্পনা তাদের শাসন-শোষণ এবং স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার অধিকার ও দাবি সেখানে একান্তভাবে উপেক্ষিত ছিলো। পাকিস্তান আমলের শিক্ষা পরিকল্পনায় দেশ, মাটি ও মানুষের সাথে কোনো সম্পর্কই ছিলো না। প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানি শাসকেরা গণতন্ত্রকে হনন করেছে, অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, রাজনৈতিক পীড়ন এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতায় পরিপূর্ণ এ শিক্ষা বিদেশের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো। এসব ছাড়াও এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বাঙালির জাতিসত্তা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং বাঙালির স্বকীয়তা ও মাতৃভাষা বাংলাকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিয়ে শিক্ষাকে ইসলামিকরণ, উর্দু ও আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান, আরবি হরফে বাংলা শিক্ষা প্রচলন এবং শিক্ষানীতিকে ধর্মীয় বৃত্তে বন্দি করে এক মধ্যযুগের আবহ সৃষ্টি করে। পাকিস্তান সৃষ্টির লগ্ন থেকেই এ প্রক্রিয়াগুলো চলে।

দেশবিভাগের পরপরই অর্থাৎ পাকিস্তানের সৃষ্টিলগ্নেই একটি শিক্ষানীতির প্রশ্ন উঠে। এরই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সনের ২৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করাচিতে নিখিল পাকিস্তান কনফারেন্সের এক সভা হয়। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও শিক্ষানীতি এবং কর্মপন্থা সম্বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়তা দান করাই এই কনফারেন্সের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো।

এই কনফারেন্সের জন্য প্রদত্ত বাণীতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্বন্ধে বলেন—

> আমাদের সন্তানদের যে ধরনের শিক্ষা দেব এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে কিভাবে প্রস্তুত করবো এর উপর আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। পাকিস্তানের গৌরব বৃদ্ধি ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার উপযোগী শিক্ষা তাদের দিতে হবে। সেই সঙ্গে চারিত্রিক গুণাবলীরও বিকাশ করতে হবে।[৪]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই বক্তব্যে কিন্তু পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মীয়করণ বা ইসলামিকরণের কোনো ইঙ্গিত নেই। এ প্রসঙ্গে আরো বলা দরকার যে, পাকিস্তান আন্দোলনে বা লাহোর প্রস্তাবের কোথাও কিন্তু রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তি ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে বা ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে হবার কথা ছিলো না। এমনকি পাকিস্তানের স্বাপ্নিক ইকবালও পাকিস্তানকে ধর্মীয় রাষ্ট্ররূপ দেবার কথা বলেননি। তাঁর বক্তব্য—

> Nor Sould the Hindus frar the creation of outonomous Muslim States will nean the Introduction of a kind Religious Rule in such State.[৫]

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে জিন্নাহ সাহেবের সুস্পষ্ট বক্তব্য—

> I am sure that is will be a democratic type, embodying the essential principles of Islam....It had taught us equality of man justice and fairplay to everybody. We are inheritors of those glorious traditions and are fully alive to our responsibilities and obligations as farmers of the future constitution of Pakistan. In any case Pakistan is not going to be a theocratic State to be ruled by priests with a divine mission. We have many non-Muslims, Hindus, Christians. Farsees. But they are all Pakistanis. They will enjoy the same rights and privileges as any other citizens and will play rightful part in the affairs of Pakistan.[৬]

কিন্তু পরবর্তীকালে গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক উলামাদের চাপে এবং গদি ও পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে বাংলাভাষা, বাঙালির জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য, সংবিধান ও শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে ঢালাই করে নেয়া হয়।

www.pathagar.com

নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন—

> ইসলামের আদর্শ ও নৈতিক গুণাবলী এবং মূল্যবোধ পাকিস্তানের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে।—ইসলাম ছাড়া পাকিস্তানের শিক্ষার ভিত্তি আর কিছু হতে পারে না।[৭]

এই কনফারেন্সের গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়—

> ইসলামের মূলনীতি ও নৈতিক আদর্শ পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হবে।[৮]
> এছাড়া সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা কার্যকরী করার কর্মপন্থা নির্ধারণের দায়িত্ব প্রস্তাবিত পাকিস্তান কেন্দ্রিয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডকে দেয়ার সিদ্ধান্ত কনফারেন্সে গ্রহণ করা হয়।[৯]

ভাষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি জটিল আকার ধারণ করে, ১৯৪৮ সনের ২১ মার্চ জিন্নাহ সাহেবের রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতার পর। উক্ত ময়দানে এক নাগরিক সংবর্ধনায় তিনি উর্দু ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন—

> কিন্তু একথা আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে—অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেন তা'হলে বুঝতে হবে যে, সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।[১০]

এই উক্তির প্রতিবাদে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি ও ঝড় উঠলেও খাজা নাজিমুদ্দিন এবং নূরুল আমীন একে সানন্দ সমর্থন জানায়। আর কেন্দ্রিয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবি হরফে বাংলা লেখার জন্য কড়া নির্দেশ প্রদান করেন।

নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা কনফারেন্স আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংবিধান সভায় সুপারিশ পাঠান যে, উর্দুকে যেন উভয় পাকিস্তানের একমাত্র যোগাযোগের ভাষা করা হয় এবং আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, 'পাকিস্তানের সকল প্রদেশে উর্দুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেয়া হবে'।[১১] এ সময় কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেন যে, বাংলা হিন্দুয়ানী ভাষা, যেহেতু এ ভাষা হিন্দুধর্ম, ইতিহাস ও কৃষ্টির সঙ্গে জড়িত, তাই এ ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হতে পারে না। কেউ কেউ আবার বাংলা ভাষাকে কাফেরী ভাষাও বলছে সুতরাং বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা মানেই ইসলাম পরিপন্থি।[১২]

এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক কুচক্রীরা আরো নতুন চক্রান্তের জাল বিস্তার করে বলে যে, বাংলাভাষার সাথে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাই বাংলাভাষাকে জাতীয় ভাষা করলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন জনতার আন্দোলন তথা গণআন্দোলনে রূপ নেয় এবং এদেশের সর্বসাধারণ সাম্প্রদায়িক কুচক্রীদের চক্রান্ত অনুধাবন করতে পারে। নিখিল পূর্বপাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে অলি আহাদ বলেন, এদেশের গণশিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থের আন্দোলনের মহীরূহ সমূলে উৎপাটনের অভিসন্ধি নিয়ে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলবার জন্য চক্রান্ত আটা হলো। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে আক্রমণ এলো বাংলা ভাষার উপর। চক্রান্ত করা হলো ভবিষ্যতের বাঙালিকে মূক করে দেবার জন্য যাতে সে মুখ ফুটে শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে না পারে, যাতে সে ভুলে যায় তার জাতীয় ও সামাজিক অস্তিত্বের মর্যাদা। ভুলে যায় তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।[১৩]

অবশেষে ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বুকের রক্ত দিয়ে এ দেশের ছাত্র জনতা বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এবং ১৯৫৬ সনের সংবিধানে বাংলাভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পায়।[১৪]

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের ঘোষণা মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের ২০টি কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলায় বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় (১৮ এপ্রিল ১৯৫০)। এবং শিশুদের আরবি হরফে বাংলা শিক্ষা দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারদের নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয় শিশুরা প্রথম ও ২য় শ্রেণীতে আরবি অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তৃতীয় শ্রেণীতে আমপারা পড়বে।[১৫]

www.pathagar.com

এই কৃত্রিম ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তান যুব সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে বলা হয়—

> বিশেষত: পাকিস্তানের শতকরা ৬২ জনের মাতৃভাষার দাবিকে উপেক্ষা করিয়া আরবি হরফে বাংলা লিখন উদ্ভট পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার জন্য অজস্র অর্থের অপচয় করিতেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, আরবি হরফে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থাকে চাপাইয়া দিলে যুবক সমাজের বিরাট অংশ চিরদিনের জন্য অজ্ঞতার ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। দেশের যুব সমাজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে।[১৬]

> সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তানকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৫৬ সনে। সংবিধানে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের কোন আইনই পবিত্র কোরান, সুন্নাহ ও ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও নীতির পরিপন্থী হবে না। পাকিস্তানের সকল মুসলমান কোরান ও সুন্নাহর ভাবধারা অনুসরণ করে জীবন যাপন করবে, পবিত্র কোরান সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে এবং মুসলমান নাগরিকগণ ইসলামের নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলন করবে।[১৭]

একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপর যতোবারই আঘাত এসেছে ততোবারই কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী এবং সংগ্রামী ছাত্র সমাজই প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছে। শুধু রুখেই দাঁড়ায়নি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্ত প্রতিহত করেছে। অতীতে যেমন এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই, বর্তমানেও।

১৯৪৯ সনের পূর্ববাংলা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কমিটি, ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। পরবর্তীকালে '৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭১ এর মহান মুক্তি সংগ্রামে এ দৃষ্টান্ত আরো উজ্জ্বল ও ভাস্বর।

১৯৫৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিটির পুনর্গঠন করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অসামঞ্জস্যতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করে একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং একটি উদার শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রস্তাব ছিলো এই কমিটির সুপরিশে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, "১৯৫১ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। প্রতিবছর পাঁচ হাজার প্রাথমিক স্কুল বাধ্যতামূলক স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করে। দশ বছরে সমগ্র প্রদেশের পঁচিশ হাজার স্কুলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যে স্কীম নেয়া হয় তা দুই বছর পরে ১৯৫৩ সনে স্থগিত করা হয়। এবং পরে ১৯৫৭ সনে প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক শিক্ষা রহিত করা হয়।"

> পরবর্তীকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ১৯৫৭ সনে আবার পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। তখনকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, জনগণের জীবনযাত্রা ও প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে একটি আদর্শ ও জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। উক্ত কমিশন খুবই অল্প সময়ে জাতীয় আদর্শ, শিশু-কিশোর ও তরুণদের মানসিকতার উত্তাপ আবহ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার আলোকে একটি রিপোর্ট তৈরি করে ও সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার করে মানবিক ও উদার শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলো।[১৮]

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো এই রিপোর্টকে পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী বলে সভাসমিতি ও পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দেয় এবং শিক্ষায় গণমানুষের অধিকারকে নস্যাৎ করে দেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো উদার শিক্ষানীতি গড়ে উঠতে পারেনি।

> এদেশের শিক্ষাকে ইসলামীকরণ ও পাকিস্তানীকরণ এবং পূর্ববাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে চিরতরে উৎপাটনের আর একটি তীব্র আঘাত আসে আয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের আর একটি চক্রান্ত এখানে। এবং এই ইসলামীকরণ আয়ুব খানের সময়ে চরম রূপ ধারণ করে। আয়ুব খান বলেন—'পাকিস্তান আদর্শগত রাষ্ট্র এবং ইসলামের মূলনীতি ও আদর্শই আমাদের জাতীয় উৎস। ইসলামের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে জাগতিক উন্নতিতে আমাদের তৎপর হতে হবে।'[১৯]

আয়ুব খান তার বক্তৃতায় আরো বলেছেন—

> ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হয়েছে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যক্রম সংশোধন করে ইসলামের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।[২০]

ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আয়ুব খান সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন—

> ইসলামী শিক্ষা পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল মুসলমান ছেলে মেয়েদের এই বিষয়ে আবশ্যকীয়ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। মিশন স্কুলগুলোতে যেন এই বিষয়কে সমান গুরুত্ব দেয়া হয় তা আমরা দেখছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে ভবিষ্যত বংশধরদের জীবন দর্শন পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশ সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় মানুষ ধর্মের উপর আস্থা হারালে অনেক সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অধিকাংশ মানুষের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং তাদের শেখানো হয়েছে তারা আত্মীকরণ করতে পারেনি—সত্যি এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২১]

এই সামরিক সরকারের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উপর যেমন চরম আঘাত হানে তেমনি শিক্ষার আর্থিক দায়দায়িত্ব শুধু জনগণের উপর ন্যস্ত করে এবং শিক্ষা সংকোচন নীতিকে প্রবল করা হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমলা ও ঔপনিবেশিক চরিত্রের আসল স্বরূপ ফুটে উঠে।

সামরিক সরকারের এই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা রুখে দাঁড়ায় এবং ব্যাপক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিচারপতি হামুদুর রহমানের সভাপতিত্বে আর একটি কমিশন গঠন করা হয়। হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বের হলে দেখা গেলো যে, এই কমিশন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন জানিয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে—

> It was not our function. As some people conceived. To Criticise report of the Commission. Our function was confined more to ascertaing the Deficiencies. If any, in Physical and Teaching facilities and on looking into matters which were causing dissatisfaction amongst students. We were not thous called upon to lay down a new educational policy nor did we consider in necessary to do so. For even these who appeared before us to criticise the report of the national commission on education were unable to point out more than two

www.pathagar.com

or three of its proposals which could be considered to be educationally Unsound.[২২]

সামরিক সরকারের সমস্ত বিধি নিষেধকে উপেক্ষা করে ছাত্র সমাজ আবার হামুদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও আন্দোলন শুরু করে। সামরিক সরকার হার মানতে বাধ্য হয় ছাত্র আন্দোলনের কাছে।

অবশেষে ১৯৭০ সনে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় তা' পূর্বতন সব শিক্ষানীতির মতোই কেন্দ্রীয় সরকারের শোষণ ও ঔপনিবেশিক সরকারের জান্তব চেহারা এবং ধর্মীয় উগ্রতা পরিস্ফুট হয়।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের বিজয় ও লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত রক্তিম পতাকা বুকে নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়, আমাদের জাতীয় চেতনার এক চিরন্তন উৎসারণ। বাঙালি জাতির জন্য এর চেয়ে বড়ো গর্ব ও গৌরবের আর কিছুই নেই। গোলামির জোয়াল ও ঔপনিবেশিকতার খোঁয়াড় হতে মুক্ত হয়ে এই প্রথম আমরা নিজেদের পরিচয় খুঁজে পেলাম। এবার আমরা সন্ধান পেলাম আমাদের উৎসের এবং আমাদের স্বরূপের ও শিকড়ের। এবার আমরা আত্মপরিচয়ে গর্বিত হয়েছি। আর এ চেতনার আলোক সম্পাত হলো আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনায়।

মানবিক ও প্রগতিশীল চেতনার আবহ নিয়ে রচিত হলো আমাদের সংবিধান, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি হিসেবে সংবিধানে সন্নিবেশিত হলো—

ক. জাতীয়তাবাদ, খ. গণতন্ত্র, গ. সমাজতন্ত্র ও ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানের এই মৌলিক ধারাগুলো শিক্ষানীতির উপরও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এরই উত্তাপ নিয়ে আমাদের নতুন শিক্ষানীতির উৎস। ১৯৭২ সনের ২৬ জুলাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদাকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়।

এই শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি ও কাঠামো এবং রূপরেখা কি হবে এ সম্পর্কে সরকারি নির্দেশ বলা হয়েছে—

> যেহেতু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য এদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের জন্য নবদিগন্তের দিশারী এক সুমহান বিপ্লব এবং বিপ্লবীচেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে ভিত্তি করে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর এবং এই উপলব্ধির আলোকে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে।
>
> যেহেতু নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রধান অংশ তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ও তাদের সুশিক্ষার উপর দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশ নির্ভরশীল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দ্রুত উন্নয়নের বাহনরূপে গঠন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পবিরর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে।
>
> যেহেতু বাংলাদেশ এক সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী এবং এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে তার ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও আদর্শের ধারক-বাহকরূপে গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।
>
> যেহেতু বাংলাদেশের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সার্বিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী ভাষণে কমিশনের সদস্যগণকে বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ সৃষ্টির জন্য নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দানের জন্য আহ্বান জানান।[২৩]

www.pathagar.com

সরকারি নির্দেশ অনুসারে ও সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উক্ত কমিশন শিক্ষার যে উদ্দেশ্য নির্ণয় করেছেন তা হলো—

> শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে ও ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[২৪]

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে কমিশনের বক্তব্য—

> শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে, যা জাতির চেতনা ও ঐক্যবোধ সংহত ও প্রসারিত করবে। এই উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীচেতনার উর্ধ্বে জাতীয় ঐক্যবোধ সুনিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দিষ্টমান পর্যন্ত সকলের জন্য এই পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
>
> সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সেজন্য সমাজের চেতনা জগতেও আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জনগণের মনে সেই সচেতনতা প্রতিষ্ঠিত করা নতুন শিক্ষানীতির লক্ষ্য হবে।

শিক্ষা কমিশন আরো মনে করে—

> গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন, সমাজের সকলের সমান অধিকার ও কর্তব্য, মৌলিক, মানবাধিকার, মানবসত্তার মর্যাদা, ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সঠিক ধারণা শিক্ষার্থীর মনে জাগ্রত করা দরকার।

উক্ত কমিশনের রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে—

> রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সুসমন্বিত মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলীর বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে করতে হবে।
>
> সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, তেমনি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করতে হবে।[২৫]

আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার আরো একটি বড়ো পশ্চাদপদতা হচ্ছে যে, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা অধীত বিষয়কে মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মস্থ করতে পারে না। অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষাটাই না বুঝে মুখস্থ এবং পরীক্ষা পাশ ও সার্টিফিকেট আর চাকরির জন্য। মাতৃভাষার মাধ্যমে আত্মস্থ করতে পারেনি বলেই শিক্ষার আলো তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না।

শিক্ষার্থীরা বড়ো বড়ো ডিগ্রি নিয়ে এক একটি টবের ফুলগাছ বা পরগাছা হয় কিন্তু দেশের মাটিতে শিকড় প্রোথিত করতে পারে না। এবং দেশের মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম ও সম্পৃক্ত হতে পারে না। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগে না। শুধু তাই নয় শিক্ষার্থীরা যতোই উপরের ক্লাসে উঠে এবং জীবন প্রতিষ্ঠিত হয় ততোই তারা নিজকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা মনে করে। তারা নিজ দেশে থেকেই নিজকে বিদেশী হিসেবে ভাবে। আমাদের শিক্ষানীতি ও পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য—

> আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অধ্যয়ন অধ্যাপনার চেয়ে পরীক্ষাই বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকে, ফলে না বুঝে মুখস্থ করার নীতি ছাত্রসমাজে বেড়ে চলেছে। কারণ মুখস্থ করার ফলে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য চিন্তাশক্তি ব্যবহার না করেই পরীক্ষায় পাশ করা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রশ্নপত্র যদি এমন দীর্ঘ বা দুরূহ হয় যার ফলে ছাত্ররা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে, অধ্যয়ন ও চিন্তা দিয়ে তার উত্তর করতে পারছে না, তাহলে পাঠ্যবস্তু মুখস্থ না করে তাদের গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু মুখস্থ করার রীতি

www.pathagar.com

> ছাত্র সমাজে প্রচলিত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে দুটো মারাত্মক কুফল অবশ্যম্ভাবী—এতে পরীক্ষকরা প্রবঞ্চিত হন এবং পরীক্ষার উপযোগিতা নষ্ট হয়। তাই মুখস্থ করার কুপ্রথা বন্ধ করতে হলে খুব দীর্ঘ বা দুরূহ প্রশ্ন রচনা বা এমন প্রশ্নপত্র রচনা যাতে মুখস্থ করে পাশ নম্বর পাওয়া যায়—আমাদের পরিহার করতে হবে।[২৬]

আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু আমাদের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা দূর হয়নি এবং পরানুগ্রহিতারও পরিবর্তন হয়নি। ঘটেনি আমাদের চিত্তবিকাশ ও আত্মবিকাশ। আমাদের শিক্ষা আজো মাতৃভাষা এবং দেশ, মাটি ও মানুষের মধ্যে শিকড় প্রোথিত করতে পারেনি। আমরা এও অস্বীকার করতে পারবো না যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে মহৎ চিন্তা ও ভাবধারা এবং বিশ্বচৈতন্যকে আত্মস্থ করার চেয়ে মুখস্থ বিদ্যার উপরই জোর দিয়েছি বেশি। ফলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় রেকর্ড পরিমাণ মার্ক পায় কিন্তু কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না সুতরাং আমাদের শিক্ষা সৃজনশীল নয়। আমরা এও ভুলে গেছি যে, মাতৃভাষার উপর গভীর দখল নেই বলেই আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য। তাই আমাদের পক্ষে শুধু বিজ্ঞান নয়—মহৎ ও কালোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিও সম্ভব নয়। আমাদের মানসিক ও আত্মিক সংকটের কারণও এখানেই।

আমাদের শিক্ষার যেখানে আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নেই—সমগ্র বাঙালি জাতিকে যেখানে ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে, মাটির আকর্ষণ থেকে ছিন্ন করে শিকড় থেকে সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা, এ কৃত্রিম শিক্ষায় কখনো মানবিক গণসম্পন্ন এবং সৃজনশীল ও দেশপ্রেমিক মানুষ গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই কৃত্রিম শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা চিরদিনই বিদেশীর কাছে সব সময়ই করুণা প্রার্থী ও নতজানু থাকবেই। কবিগুরুর ভাষায় শেষ করছি—

> প্রত্যেক দেশের জাতীয় শিক্ষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। একটি বিশেষ ধর্ম আছে। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ তার আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে যদি তার প্রতিষ্ঠা হয় জাতীয় ভিত্তির উপর। বিশাল বনস্পতির লক্ষ্য হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশে তার শাখা-প্রশাখা মেলে দিয়ে তার সবুজপত্রে আলো ছায়ার লীলা অনুভব করবে। আশ্রয় হবে পক্ষীকুলের এবং আপন বিরাটত্বের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বিরাট মহিমা ঘোষণা করবে। সেইজন্য বনস্পতির প্রয়োজন সরস ভূমির আপন মূলের সাহায্যে ভূমির গভীরতা থেকে প্রতিনিয়ত জীবনরস সংগ্রহ করে এবং সর্বদেহে সঞ্চারিত করা। অনুরূপভাবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাও জাতীয় জীবনের সংগে যোগ রেখে, দেশের চিত্ত থেকে আপন জীব রস-সংগ্রহ করে এবং সর্বাংগে সঞ্চারিত করে জাতির চিত্তকে প্রস্ফুটিত করে। শিক্ষা ব্যবস্থার এই ভিত্তিমূল শিথিল হলে তার সাহায্যে মানুষ আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।[২৭]

মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহী ছিলেন এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখিয়েছে এ তথ্য সঠিক নয়। তাছাড়া মুসলিম শাসনামলে মুসলমানরাই বেশি জমিদার ছিলেন আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানেরা জমিদারি হারিয়ে ফেলে এবং মুসলমান সম্প্রদায় গরিব হয়ে যায়—এমন ধারণা করাও ভুল। আসলে পলাশীর পটপরিবর্তন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক ও সামাজিক কারণ এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক ও শিক্ষানীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলেই শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানেরা পেছনে পড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে ও নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এবং শিল্পের বিকাশ ও নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ বা অনীহা নয়—বরং প্রশাসনিক পরিবর্তন, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি ও শিক্ষানীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে যে সামাজিক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ধ্বস নামে একেই বড়ো নিয়ামক হিসেবে দেখতে হবে। পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে একটা পরিবর্তন আসে। এ পরিবর্তনের ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. আনিসুজ্জামান বলেছেন—

> উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলাদেশের পাট চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। অষ্টম দশকের শুরু থেকে পাটের চাহিদা ও চাষ দুই-ই গেল বেড়ে। গত

www.pathagar.com

শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে তা আরো বেড়ে যায়। পাটের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা প্রধানত মুসলমান প্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গের চাষীরাই মিটিয়েছিলেন, একথা মনে রাখতে হবে। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের হাতে কিছু পয়সা এসেছিল এবং তাদের মধ্যে সন্তান-সন্ততির শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল এমন অনুমান করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত: কলিকাতার সাহেবদের খানসামারাও কিছু কিছু দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদেরকে আহার ও বাসস্থান দিয়ে এবং শিক্ষার ব্যয় বহন করে তাদেরকে পড়বার সুযোগ দিতেন। এই দায়িত্ব তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে পালন করতেন।[২৮]

ড. আনিসুজ্জামানের এই গবেষণামূলক বিশ্লেষণ যথার্থ ও সার্থক এবং আধুনিক গবেষকেরাও এ বিষয়ে একমত। হেস্টিংস-এর মিনিটেও আমরা এর ইঙ্গিত পাই—পৃ. ১৬—

> Since the management of the revenues has been taken into our hands it was chielfy been carried on by the English servants of the company and by the Hindus...In consequence of this change the Mahomedan families have lost their sources of private emoluments which would enable them to bestow much expense on the education of their children and are deprived of the power which they formerly posessed of endowing and patronising public seminaries of learnigs.[২৯]

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তখন আরবি ও ফারসির মাধ্যমে মাদ্রাসার শিক্ষা যে দেশীয় পাঠশালা ও টোলগুলো হতে অনেক উন্নত ছিলো এ প্রসঙ্গে Adam's Report-এর বরাত দিয়ে কাজী আবদুল মান্নান সাহেব বলেছেন—পৃ. ৪৭—

> শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের এই শোচনীয় দুর্গতির কালেও ফারসী এবং উচ্চ শ্রেণীর আরবী মাদ্রাসার শিক্ষকগণ বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে অনেক উন্নত ছিলেন। দেশের অন্যান্য শিক্ষায়তনের তুলনায় ঐসব মাদ্রাসার শিক্ষণীয় বিষয় অনেক প্রশস্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। সমগ্রভাবে বিচার করে দেখলে, হিন্দু শিক্ষায়তনের পদ্ধতির তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতি অনেক উন্নত ও উদার ছিল। মাদ্রাসায় মুসলমান পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা হিন্দু পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছাত্রের চেয়ে উন্নত মনীষার অধিকারী ছিল।[৩০]

আরবি ফারসি মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা ইউরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান অর্জন করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার ক্ষুণ্ন করে না এমন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তাঁরা সেটা উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করতেন। শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মানসিকতা বিশ্লেষণ করে এ্যাডাম আরো বলেছেন—

> ইউরোপীয় ভাবধারা গ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষিত হিন্দুর চেয়ে শিক্ষিত মুসলমানের মানসিক প্রস্তুতি অনেক বেশি। যখন তারা আমাদের প্রচেষ্টার আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারবেন এবং যে শিক্ষা আমরা দিতে চাই তার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে পারবেন, তখন তাঁরাই হবেন আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সহযোগী।[৩১]

নতুন শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিতে শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানেরা আগ্রহী নয় এ ধারণাও সঠিক নয়। এ্যাডাম এ সম্বন্ধে বলেন—

> ফারসী-মাদ্রাসায় শিক্ষক ও ছাত্ররা ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান অর্জন করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁদের সামাজিক সংস্কার ক্ষুণ্ন করে না এমন পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে তাঁরা সেটা উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ

www.pathagar.com

করতেন।[৩২] কোলকাতার বাইরেও মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিলো।

মুর্শিদাবাদের মুসলমানদের আগ্রহে গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি মি: লক ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে সরকারকে জানালেন যে, নওয়াব পরিবার ও স্থানীয় মুসলমানদের লেখাপড়ার জন্য মুর্শিদাবাদে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং মুসলমানগণ সে-সুযোগ গ্রহণ করে। এ ধরনের ঘটনা ঢাকাতেও ঘটে। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বিশপ হেবারের কাছে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু এ-সম্পর্কে কোনই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।[৩৩]

হাজার হাজার বছর ধরে বিজাতি ও বিভাষীদের শাসন ও আমাদের নিজেদের সত্তা ও পরিচয়কে যেমন আমরা ভুলে পরগাছা-বৃত্তি অবলম্বন করছি তেমনি বিজাতি ও বিভাষীরাও আমাদের উপর অনেক ভুল তথ্যের স্তূপ চাপিয়ে দিয়ে গেছে। মৌলিক কোনো গবেষণার দৃষ্টিতে না দেখে এ সমস্ত ভুল তথ্যকে আমরা অবনত মস্তকে মেনে নিচ্ছি। আসলে শিকড়ের সন্ধানে ও পরিচয়ের সন্ধানে আমরা মোটেই তৎপর নই।

ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভ না করলে অন্য ভাষায় পণ্ডিত হওয়া যায় না এ ধরনের ধারণাও ঠিক নয়। উনিশ শতকের আগে এবং উনিশ শতকেও এদেশে সংস্কৃত বাংলা ও আরবি-পারসি ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিতজন ছিলেন এবং ইংরেজি শিক্ষার বৃত্তের বাইরেও এদেশে একটা উন্নত শিক্ষার আবহ সৃষ্টি হয়েছিলো তা' ইতিহাসেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এসব ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে অনেক মুসলমান পণ্ডিত ছিলেন তা প্রাপ্ত দলিলপত্রই সাক্ষ্য দেয়। ড. এম. কে. এ. সিদ্দিকী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কর্মরত ৩০ জন পণ্ডিতের কথা বলেছেন এবং ২২ জনের নামও উল্লেখ করেছেন। যেমন—

১. সৈয়দ বকসিস আলী ফৈজাবাদী
২. মোহাম্মদ আলী ইবনে নিসার আলী
৩. সৈয়দ মনসুর আলী হোসাইন
৪. ফজর আলী ফজলী
৫. মোহাম্মদ বকস
৬. মীর মোহাম্মদ আতাখান তহসীন
৭. মীর আজম
৮. মীর বাহাদুর আলী হোসাইন
৯. মীর শের আলী আফসোম
১০. হায়দার বকস হায়দারী
১১. মহজার আলী খান ওয়েলা
১২. মীর্জা কাজিম আলী জওয়ান
১৩. হাফিজউদ্দিন বর্ধমানী
১৪. খলিল আলী আশক
১৫. মীর মইনুদ্দীন ফয়েজ
১৬. বাসিত খান
১৭. আমানতুল্লা সৈয়দ
১৮. মীর্জা লুৎফ
১৯. মীর্জা জান তাপিস
২০. মৌলভী ইকরাম আলী
২১. মীর্জা মোঘল নিশান
২২. খান নেয়ামত[৩৪]

www.pathagar.com

টমাস রোবাক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আরবি-পারসি ও উর্দু বিভাগে কর্মরত ৩৩ জন মৌলবী মুনশীর নাম দিয়েছেন। তাঁরা হলেন—

১. করম হোসেন
২. আবদুর রহিম
৩. জান আলী
৪. শেখ আহম্মদ
৫. বাহাদুর আলী
৬. হোসেন আলী
৭. তেগ আলী
৮. হিসাম উদ্দীন
৯. মির্জা নূর আলী
১০. মওলা বকস
১১. আব্বাস আলী
১২. কোরবান আলী
১৩. নাদির আলী
১৪. মির্জা হাসান আলী
১৫. সৈয়দ কাজিম আলী
১৬. ফরহাত আলী
১৭. মহম্মদ আলী
১৮. কলব আলী
১৯. মীর বকসিস আলী
২০. মহম্মদ ওয়াসি
২১. বাব উল্লাহ
২২. মহম্মদ ওয়াজিদ
২৩. মর্তুজা খান
২৪. ইউসুফ আলী
২৫. আবদুস সামাদ
২৬. নজরুল্লাহ
২৭. ওয়াজিব উদ্দিন
২৮. দলিল উদ্দীন
২৯. মাহফুজ আলী
৩০. মীর তসাদ্দক হোসেন
৩১. বাহাদুর আলী
৩২. মীর মনসুর আলী
৩৩. মীর সৈয়দ আলী[৩৫]

কোলকাতার 'স্কুল বুক সোসাইটি'র পরিচালনা কমিটিতে চারজন মুসলমান সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন—

১. মৌলবী আমানুল্লাহ
কোম্পানির উকিল, সদর দেওয়ানি
২. মৌলবী করম হোসেন
আরবি ফারসি পণ্ডিত

www.pathagar.com

৩. মৌলবী আবদুল ওয়াহিদ
সোসাইটির সম্পাদক
৪. মৌলবী আবদুর হামিদ

ক্যালকাটার 'স্কুল সোসাইটি'র পরিচালনা কমিটিতেও চারজন মুসলমান সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন—

১. মীর্জা কাজিম আলী খান
সরকারি সেক্রেটারি অফিসের ফারসি মুনশী
২. বেলায়েত হোসেন
মুফতি, কলিকাতা হাইকোর্ট
৩. দরবেশ আলী
বেনারসের রাজার উকিল
৪. নূরুন্নবী
রামপুরের নবাবের উকিল[৩৩]

এ সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানেরাও অজ্ঞ বা অনাগ্রহী ছিলেন একথা বলা যায় না।

কাজী আবদুল ওদুদ অবশ্যি মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার অনগ্রসরতা প্রসঙ্গে অন্য মন্তব্যও করেছেন—

> মুসলমানেরা যে দু'টি কারণে ইংরেজি শিখতে এগুলোনা তার প্রথমটি ধর্মনাশ ভয়—এ সময়ে দেশে খ্রীস্টান করবার ও হবার হিড়িক পড়ে যায়—কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণের চাইতে অনেক বড় সেটি—নব রাজশক্তির প্রতি মুসলমানদের বিরূপতা দীর্ঘ ওহাবী বিদ্রোহের ভিতরে রয়েছে যার সুস্পষ্ট পরিচয়।[৩৭]

এ প্রসঙ্গে নিম্নের বক্তব্য বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য—

> ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ কিভাবে গড়ে ওঠে তা-ও লক্ষ্য করার বিষয়। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নির্দেশানুযায়ী শিক্ষা কমিটি হিন্দু কলেজকে একের পর এক অনুদান দিতে থাকে। ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাসিক পনের টাকা হারে বৃত্তি প্রদান ছাড়াও মাসিক ৩০০ টাকার অনুদান এই কলেজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য ৪৯,৩৭৬ টাকা এবং ইংলন্ড থেকে পুস্তক আনয়নের জন্য ৫,০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া ইংরেজী ও গণিতবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এডুকেশন প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক টাইটলার সাহেবকে এই কলেজে অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এ কলেজের বার্ষিক অনুদান দাঁড়ায় ৩০,০০০ টাকা। অপর পক্ষে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা মাদ্রাসা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা-কমিটির কাছ থেকে পেয়েছে শুধু উপেক্ষা। এই অবহেলার কথা ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর কমিটির কাছে তুলে ধরা হয়। ফলে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে ৩রা মার্চে এই মাদ্রাসায় ইংরেজী ক্লাশ খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আগস্ট মাসের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ জন। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৬ জনে পৌছায়।[৩৮]

একথাও অবশ্যি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজি শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার নিজেও সচেতন ছিলেন। এবং তারা জানতেন যে, এ দেশবাসী আধুনিক শিক্ষিত হলে তারাই দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে। জনৈক ইংরেজের বক্তব্য—

www.pathagar.com

> ইংরেজী শিক্ষার কাল ভারতবাসীর মনে একদিন আত্মকর্তৃত্ব লাভের বাসনা জাগবে এবং তখন আমাদের ভারতবর্ষ থেকে চলে আসতে হবে।...নিজেদের শক্তি সম্বন্ধেও তারা সচেতন হবে ও নিজ শক্তির পরিণাম বুঝতে পারবে। এর ফল হবে এই যে, তারা স্বদেশ থেকে প্রত্যেক শ্বেতকায় ব্যক্তিকে বার করে দিতেও স্বভাবতই দ্বিধা বোধ করবে না।[৩৯]

মুসলমানেরা এদেশে ছয়শত বছর রাজত্ব করেছে। এ সত্যটি মেনে নিলে অবশ্যিই বলতে হয় যে, এই ছয়শত বছরে ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষায় একটা গৌরবময় মুসলিম ঐতিহ্যও গড়ে উঠেছিলো এবং এ শিক্ষার যে একটা উন্নতমান ছিলো তা'ও অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘদিনে মুসলিম ঐতিহ্যে লালিত ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার আলোকে এদেশে যে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতজন সৃষ্টি হয়েছে তা'ও সত্য।

দীর্ঘ কয়েক শত বছরে গড়ে ওঠা শিক্ষার এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তুড়িমেরে উড়িয়ে দিয়ে মেকলে সাহেবের নকল মানুষ গড়ার শিক্ষানীতিকে মুসলমানেরা যদি প্রথমে অতি আগ্রহভরে গ্রহণ করতে না পারে তবে তাও একেবারে অবাস্তব নয়। ইংরেজ আসার পর ভাষা ও শিক্ষানীতির পরিবর্তনে হিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হলেও মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। রাজভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষাকে চাপিয়ে দেয়াকেও সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না। এখানে আরো একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলমানদের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার সাথে আরবি ভাষার একটি গভীর আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি মুসলমান পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো আরবি ভাষার মাধ্যমে। আরবি ভাষার সাথে ফারসি ভাষার ছিলো একটি গভীর সম্পর্ক। তা'ছাড়া ফারসি ছিলো রাজভাষা। অভিজাত মুসলিম পরিবারের লোকেরা পারিবারিক ভাষা বা মৌখিক ভাষা মনে করতো উর্দুকে। বাংলাদেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা হলেও আরবি ও ফারসি ভাষাকেও তারা সম্মান ও গৌরবের ভাষা হিসেবে একটা আলাদা মর্যাদা দিতো।

আসলে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার অনগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতা এবং দুর্ভাগ্যের মূল কারণ যে হঠাৎ আলাদিনের প্রদীপের মতো জ্বালিয়ে দেয়া শিক্ষা নীতি এ বিষয়টি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার ও তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

মুসলমানদের জন্য আধুনিক শিক্ষা প্রসারে উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বাংলাদেশে নওয়াব আবদুল লতিফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ বাস্তব দৃষ্টি দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করলে বাঙালি মুসলমানদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে। তাই তিনি বাঙালি মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় বিমুখ যে, সরকারের এই মনোভাব খণ্ডন করে নওয়াব আবদুল লতিফ সরকারের শিক্ষানীতি ও মুসলমানদের প্রতি বিমাতাসুলভ মানসিকতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে—

> বহুকাল পর্যন্ত তারা শুধু হিন্দুসমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং হিন্দুদের পরামর্শক্রমেই শিক্ষার ব্যবস্থা করে। মুসলমানদের অনগ্রসরতার জন্য সরকার সুযোগমত তাদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে সংস্কারের কথা তুলেই ক্ষান্ত থাকে। তাদের ব্যাপারে এই সহজ সমাধান অবশ্য সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। অনেকেই একথা উপলব্ধি করেছেন যে, সরকারের শিক্ষানীতি ও তার পরিণাম সব সময় একতরফা ছিল। পরবর্তীকালে সরকারী নীতির এই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা নিতে গিয়ে দেখা গেছে যে, বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংস্কারক যত বড় করে দেখা হয়েছিল আসলে সেটা তত বড় নয়।[৪০]

আবদুল লতিফের প্রচেষ্টাতেই কোলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে একশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে একটি রচনার প্রতিযোগিতার আহ্বান করেন। রচনাটি হলো—

www.pathagar.com

Advantages of an English education to the Mahomedan you in India, and the most unobjectionable means of imparting such instruction.

রচনাটির ভাষার মাধ্যম ছিলো ফারসি। লেফটেনান্ট গভ: স্যার জে. পি. গ্রান্ট হুগলী জেলার মুসলমান ছাত্রদের অভিযোগ সম্বন্ধে জানতে চাইলে আবদুল লতিফ এর উপর একটি বই লেখেন। বইয়ের মূল বিষয় হচ্ছে—

মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা, বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের অবস্থা, মুসলমান শিক্ষিত সমাজের অসুবিধা এবং তাদের ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে যথোপযুক্ত আরবি শিক্ষার ব্যবস্থা করার।[৪১]

নওয়াব আবদুল লতিফের শ্রেষ্ঠকীর্তি 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' (১৮৫৬) প্রতিষ্ঠা। এই সোসাইটি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

In 1863. Nawab (then Moulvie) Adbool Luteef Khan Bahadur conceived the idea of arousing the Mahomedan community into literary activity and public spirit by establishing a Society, where Mahomedans might meet for intellectual enlightenment and social intercourse. The idea was communicated to and approved by, several of the most learned and influential members of the community, and with their co-operation of Meeting was convened at his house on the 2nd April 1863, attended by a large number of the most respectable Mahomedans of the Metropolis under the Presidency of the late Moulvie Mahomed Wajeeh, the Head Professor of the Arabic Department of the Calcutta Madrassha—the most learned Arabic scholar of his day and the acknowledged head of the learned and respectable classes of the Mohomedan Community in Bengal. At this, the first Meeting, Nawab Abdool Luteef Khan read a Paper in Persian, on the advantages of such Meetings for the purpose of imparting useful information to the better classes of the Mohomedan Community, who were mostly unacquainted with the English language. Moulvie Mahomed Abdoor Rouf, head Translator in the Indian Legislative Department, and his assistant, the late Moulvie Adbool Hakeem and the Venerable Chairman also read Papers on the same subject. The business of the day concluded with the reading by one of his pupils of an interesting and instructive lecture, composed by the Venerable Chairman himself, refuting some of the Doctrines of the Wahabis.[৪২]

নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁর 'Pamphlet' বলেন—

My Pamphlet on the Hoogly Madrassah (written in December, 1861) was given out to the public about the middle of 1863.

www.pathagar.com

About the same time, my much esteemed friend, the well-known Moulvie Syed Ahmud Khan Bahadoor, then Principal Sudder Ameen of Ghazipore, visited Calcutta for the first time and was my honoured guest. He happened to attend the sixth monthly meeting of the recently formed Mahomedan Literary society, and at the meeting he delivered a lecture in persian on 'Patriotism and the necessity of promoting knowledge in India.' shortly after his return form Calcutta, my learned friend issued a Prospectus for the "Establishment of a Society, the object of which was to print cheaply in Hindu. Urdoo, Persian and Arabic, the best works of our own authors and translations of the best works of European and American authors.[৪৩]

এ প্রসঙ্গে The Central National Mohomedan Assocition (১৮৭৮)-এর কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনের আদর্শ ও আদর্শ সম্বন্ধে Rules and Objects of the Central National Mohomedan Association পুস্তিকায় বলা হয়—

The present backward condition of the Indian Moslems is due partly to internal and partly to external causes. The disintegration of Mahommedan society, the decadence of their principle families, and the general ruin which has overtaken all classes of the Mussulman community, combined with the absence of any means to represent to Government, faithfully and honestly, the views of the Mussalmans of India, have placed them in a most disadvantageous position as regards political influence and power relatively to the other Indian communities. It may safely be affirmed that until the establishment of the Central National Mahommedan Association, there existed no political body among the Indian Mahommedans, capable of representing to the Government, form a loyal but independent standpoint, the hopes and aspirations, the legitimate wants and requirements of the large body of Moslems in this country, who by their number and homogencity constitute such an important factor in all questions concerning the welfare of India. The few Mahommedan societies which had been formed here and there were in the main. literary and scientifie, having for their ostensible object the promotion of a destire for European knowledge among the Mahommedans. The absence of a really representative political institution occasionally forced the Government to consult these societies upon questions affecting the Mahommedan community of particular localities. The opinions thus elicited

www.pathagar.com

hardly, respesented, however, the views of the leaders of thought among them, who were alive to the exigencies of the times. The factions and cliques into which the Mahommedan community was divided not only prevented their acting in concert with their Hindoo and Christian fellow subjects on general questions of public policy, but absolutely precluded the possibility of collective action in the way of social progress and reform. In order to obviate the difficulties under which the Mahommedans have laboured.....the Central National Mahommedan Association was instituted six years ago for the protection and conservation of the general interest of the community."

"The Association has been formed with the object of promoting by all legitimate and constitutional means, the wellbeing of the Mussulmans of India. It is founded essentially upon the principle of strict and loyal adherence to the British crown. Deriving its inspiration from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmony with western culture and the progressive tendencies of the age. It aims at the political regeneration of the Indian Mahomedans by a moral revival, and by constant endeavours to obtain from Government a recognition of their just and reasonable claims."

"The Association does not, however, overlook the fact that the welfare of the Mahommedans is intimately connected with the wellbeing of the other races of India. It does not, therefore, exclude from its scope; the advocacy and furtherance of the public interests of the people of this country at large.

হান্টার সাহেবের সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনে এদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে ১৭ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়—তা' Mahomedan Literary Society ও National Mahomedan Association উভয়েরই প্রচেষ্টাকে দাবি করা হয়। দফাগুলো এখানে উপস্থাপিত করছি—

The following recommendations were made by 'The Education Commission' :

1. "That the special encouragement of Mahomedan Education be regarded as a legitimate charge of Local, on Municipal and on Provincial Funds.
2. That indigenous Mahomedan schools be liberally encouraged to and purely secular subjects to their curriculum of instruction.
3. That special standards for Mahomedan Primary School be prescribed.

www.pathagar.com

4. That Hindustani be the principle medium for imparting instruction to Mahomedans in primary and middle schools, except in localities where the Mahomedan Community desire that some other language be adopted.
5. That the official Vernacular, in places where it is not Hindustani, be added as a voluntary subject to the curriculum of Primary and Middle Schools for Mahomedans, maintained from public funds : and that Arithmetic and accounts be taught through the meium of that Vernacular.
6. That in localities where Mahomedans form a fair proportion of the population, provision be made in Middle and High Schools, maintained from public funds, for imparting instruction in the Hindustani and Persian languages.
7. The higher English Education for Mahomedans, being the kind of education in which that community needs special help, be liberally encouraged.
8. That where necessary a graduated system of Special Scholarships for Mahomedans be established.—to be awarded—
   a. In Primary Schools and tenable in Middle Schools.
   b. In Middle School and tenable in High Schools.
   c. On the results of the Matriculation and First Arts Examination and tenable in Colleges.
9. That in all classes of Schools mainteined form public funds, a certain proportion of free-studentship be expressly reserved for Mahomedan students.
10. That in places where Educational Endowments for the benefit of Mahomedans exist and are under the management of Government the funds arising from such Endowment be devoted to the advancement of Education among Mahomedans exclusively.
11. That where Mahomedan Endowments exist and are under the management of private individuals or bodies, inducements by liberal Grants in-aid be offered to them, to establish English Teaching Schools or Colleges on the Grant-in-aid system.
12. That, where necessary, normal Schools or classes for the training or Mahomedan teachers be established.
13. That, wherever instruction is given in Mahomedan Schools through the medium of Hindustani, endeavours be made to secure, as far as possible, Mahomedan teachers to give such instruction.
14. That Mahomedan inspecting Officers be employed more largely than hitherto for the inspection of Primary Schools for Mahomedans.

www.pathagar.com

15. That Associations for the Promotion Mahomedan Education be recognised and encouraged.
16. That in the Annual Reports on public Instruction, a special Section be devoted to Mahomedan Education.
17. That the attention of the Local Government be invited to the question of the proportion in which the patronage is distributed among educated Mahomedans and others.

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বলা হয়েছিলো—

> ...Promote the study of the Arabic and persian languages and of Mahomedan law, with a view more especially to the production of qualified officers for the courts of justice.[৪৪]

ভাষা প্রশ্নে নওয়াব আবদুল লতিফ-এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। নওয়াব আবদুল লতিফের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি আসলে—

ক. সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হোক তা পছন্দ করতেন না।
খ শিক্ষায় বাংলা ভাষা নয় আরবি ফারসি ও উর্দু ভাষার তিনি সমর্থক ছিলেন।
গ. পাশ্চাত্য শিক্ষার চেয়ে ভেতরে ভেতরে ইসলামি শিক্ষার প্রতিই তাঁর অনুরাগ ছিলো।
ঘ. মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর চাকরি লাভের জন্যই তিনি ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন।
ঙ. শিক্ষায় সাধারণ মুসলমানের মধ্যে চিন্তার বিপ্লব আসুক তা তিনি চাইতেন না।
চ. প্রাচ্য শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষার সপক্ষে তিনি ছিলেন।

আরবি ফারসি শিক্ষার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির পক্ষ থেকে আবদুল লতিফ বলেছিলেন—

> Unless a Mahomedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mahomedan society ; i.e., he will not be regarded or respected as a scholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Mahomedan Community. Consequently a Mahomedan who has received an English education, and has omitted the study of the persian and Arabic, it little able to impart the benefit of the education to the members of his community, But, if he knows Persian and Arabic along with English, he acquires influence in society and is of course sure to use his influence in the interests of the Government. The Government should, therefore, in my humble opinion, deviese such means whereby the Mahomedans may be taught at once English and Persian and Arabic.[৪৫]

আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবেই রিফর্মড মাদ্রাসা শিক্ষার কথা এসে যায়। আগে মাদ্রাসাগুলিতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু এতে চাকুরির কোনো ব্যবস্থা হতো না। তাই প্রথমে কোলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসায় আরবি ভাষাকে আবশ্যিক ভাষা হিসেবে রেখে পাঠ্য তালিকায় পার্সি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি এবং উর্দু ভাষার বাংলা রাখা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার এই রীতিকে রিফর্মড মাদ্রাসা শিক্ষানীতি বলা হয়। এর পক্ষে নিম্নের যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়—

www.pathagar.com

১. রিফর্মড মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বারা ইহকাল ও পরকাল দুইই রক্ষা করা সম্ভব।
২. রিফর্মড মাদ্রাছা দ্বারা কিছু সংখ্যক মুসলমানের ১০-দশ টাকা হইতে ২০-কুড়ি টাকা বেতনের চাকরী হয়ে থাকে। (অবশ্য সিনিয়র মাদ্রাছার সংখ্যা এখনও এত কম যে তাহার শিক্ষকগণের বেতন কিছু বেশী হইলেও তাহা গণনার মধ্যে ধর্তব্য নহে।) এটা দুর্দিনে এই দশ বিশ টাকার চাকরীও একটা বিবেচনার বিষয় বটে।
৩. মুছলমান গ্রন্থকারগণের পুস্তক প্রায়ই হিন্দু-পরিচালিত স্কুলে পাঠ্য হয় না। বাঙ্গলাদেশে বহু সংখ্যক এ ধরনের মাদ্রাছা স্থাপিত হইয়াছে মুছলমান গ্রন্থকারগণ তাহাদের পুস্তকের চাহিদা পাইয়াছেন।
৪. আর মুছলমান ছাত্রগণ হিন্দু বালকগণের সহিত একসঙ্গে স্কুলে পড়িয়া এবং অ-মুছলমান লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অনৈছলামিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। মাদ্রাছা শিক্ষা দ্বারা তাহা প্রতিরোধ করা যাইতেছে।[৪৬]

এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আবুল হুসেনের বক্তব্য হলো—

> আজ আমরা মাদ্রাসা তুলে দিয়ে আধুনিক জ্ঞানগুণের চর্চা করতে যেন ভয় পাচ্ছি পাছে মুসলমান সব 'মুসলমানী' হতে বঞ্চিত হয়।...পাছে আমাদের চাকরী না জুটে। এটুকু আমরা বুঝছি না কটা লোক আর চাকরী পাবে আর এই কটা চাকরীর জন্য আমরা কি ভয়ানক দাম দিচ্ছি।...এই দেখুন নবমাদ্রাসা শিক্ষা। বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ বারবার মাদ্রাসা বাতিক বেড়েছে। খুব প্রশংসার কথা কিন্তু তাতে তৈরী হচ্ছে কি? তাতে শিক্ষাপ্রীতি না বেড়ে বাড়ছে শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা, তাতে জ্ঞানের উদারতা ও শক্তি না বেড়ে বাড়ছে ধর্মান্ধতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা, তাতে সত্য অনুসন্ধিৎসা না জেগে জাগছে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, পর ধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য আকুল আগ্রহ স্বধর্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগ, অজ্ঞতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন আত্মপরিতৃপ্তি ও নিজেকে সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে ইংমিনানে থাকার মনোবৃত্তি, বাহ্যিক পরিচ্ছদ দিয়ে অন্তরের দৈন্য লুকিয়ে লালন করবার প্রবৃত্তি এবং তাতে বাড়ছে নৈতিক ভীরুতা (moral depravity) স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি হৃদয়হীনতা, জ্ঞানার্জন পরাঙ্মুখতা ও ব্যক্তিত্বহীনতা।[৪৭]

এই রিফর্মড মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে কাজী আনোয়ারুল কাদীর তাঁর 'বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গল্প' প্রবন্ধে বলেন—

> একদল অভিভাবক আছেন যাঁরা এখনও স্কুল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শিক্ষার বিরুদ্ধে। তাঁরা যে কোন শিক্ষার স্বপক্ষে তা ঠিক করে বলা কঠিন। প্রথমে তারা ইংরাজী শিক্ষা কাফেরী এলেম বলে বর্জন করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাঁরা ধর্মশিক্ষা চান। ধর্ম-শিক্ষার জন্য কলকাতা, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসা পাশ করে পেটের অন্নের সংস্থান হয় না। তখন কি করা যায়? অধুনা নতুন ধরনের মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। এখানে ইংরাজী শিখতে বাধ্য নাই। তবে বেশী ইংরাজী শিখলে হয়ত গোনা হবে এরূপ ভাব মনের কোণ কানচি খুঁজলে বোধ হয় বেশ কিছু পাওয়া যাবে।...তবে মোটের ওপর বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা বুদ্ধির মুক্তি চাই না। আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, দর্শন, বিজ্ঞান আর যত যা-কিছু সব বাদ দিয়ে শিক্ষাটুকু হলেই বস্ বলতে চাই।[৪৮]

আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও এঁদের মুখপত্র 'শিখা' অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের সমস্ত কর্মকাণ্ডই ছিলো প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনায় ভাস্বর। মন ও আত্মার মুক্তিকে কেন্দ্র করেই তাদের চিন্তা ও চেতনা সঞ্চয়মান ছিলো। তাঁদের মূল কথা ছিলো—

> জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

www.pathagar.com

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন—

> বুদ্ধির মুক্তির আদর্শ নিশ্চয়ই খুব সহজ-সাধ্য আদর্শ নয়, তবে মানুষের সাধনা দিন দিন কঠিনতর হচ্ছে, আর এতেই তার আনন্দ, তাই ভয় পাবারও কিছু নেই। আজ হয়ত মুসলমানের পক্ষে প্রয়োজন একান্ত করে ভাবা কোনটির কি ফল। তারই সঙ্গে inferiority complex-এর স্থানে জীবনে আনন্দ ও শ্রদ্ধা এবং মানুষের অসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাস তার পক্ষে যদি সত্য হয়—তবে সেটি হবে তার পক্ষে ও জগৎ বা বৃহত্তর দেশের পক্ষে যে এক দৈব অনুকম্পা। তা হলে আজকের এই পতিত ভারতীয় বা বাঙালী মুসলমানই হবে অন্তত: তার নিজের দেশের জন্য কল্যাণের সিংহদ্বার।[৪৯]

জনাব আবুল হুসেনের বক্তব্যও একই রকম—

> মানব-মন বন্ধন সৃষ্টি করছে, আর সৃষ্টির মোহে মুগ্ধ স্তব্ধ না হয়ে, সে মোহকে ছিন্ন করে আবার নূতন সৃষ্টি করছে। এমনি করে বারবার গড়তে আর ভাঙতে ভাঙতে আর গড়তে যে মন দ্বিধা বা ক্লান্তি বোধ করে না, সে মন মুক্ত, আর তারই পক্ষে সম্ভব হবে জনসাধারণকে মুক্তির সন্ধান দিতে। মনের বহুদিক আজ বিকশিত হয়েছে বলে মানুষ নানা প্রকার মুক্তির জন্য ব্যগ্র হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মুক্তি (Political Emancipation), জাগতিক জীবনের প্রয়োজন অনুসারে আর্থিক ও সামাজিক মুক্তি (Civic & Economic Emancipation) সম্পর্কে নানা প্রকার আন্দোলন হচ্ছে। এ সমস্তের মূলে রয়েছে মনের মুক্তি (Intellectual Emancipation)। সে মুক্তি যেখানে নাই, সেখানে অন্য কোন মুক্তির আন্দোলন জন্মলাভ করতে পারে না।[৫০]

চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ নয়—চাকুরি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দের জন্যই মুসলমানেরা প্রথমে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এ সম্বন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন—

> শিক্ষার দুটি আদর্শ আছে—একটি প্রয়োজনের আর একটি অপ্রয়োজনের। প্রথমটি ক্ষুদ্র আদর্শ, কেননা অর্থ সমৃদ্ধির দ্বারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করাই তার লক্ষ্য, দ্বিতীয়টি বৃহৎ, কারণ মানুষের মনোবিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়াই তার কার্য। আমার মনে হয়, প্রথম আদর্শটি সামনে রেখেই আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। তাই বৃহৎ ব্যক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ আজ আমাদের সমাজে দেখতেই পাওয়া যায় না।[৫১]

বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে আবুল হুসেন বলেছেন—

> একশত বৎসর পূর্বে হিন্দু সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানকে বরণ করেছিল—আর একশত বৎসর পরে আমরা সেই আরবী শিক্ষাকেই পুনঃপ্রবর্তিত করছি নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে। প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয় নাই। আজ তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরাজী জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছি।[৫২]

নারী সমাজের দুর্গতির জন্য কাজী মোতাহার হোসেন অবরোধ প্রথা তথা পর্দাপ্রথাকে দায়ী করেছেন এবং নারীসমাজে শিক্ষা বিস্তারে এই প্রথার অবসান হবে বলেই তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন—

> বাঙালী মুসলমান সমাজে উৎসব আনন্দে, তীর্থে, পূজা-পার্বনে হিন্দু-নারীর স্থান চিরদিনই ছিল। এখন শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সর্ববিষয়েই পুরুষের সমকক্ষতা করিতেছেন। তাঁহারা শুধু গৃহে আনন্দ বিতরণ নয়, বাহিরে শুধু পুরুষকে উৎসাহ দান নয়, নিজেরাই সমস্ত কর্মে পুরুষের সহকর্মিনী ও সমস্ত ধর্মে পুরুষের সহধর্মিনী হইতেছেন। এ বিষয়ে বাঙালী মুসলিম-মহিলারা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। শিক্ষার চাঞ্চল্য পর্দার কুহক কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে তাঁহাদের সত্বর মুক্তি নাই।[৫৩]

www.pathagar.com

স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের একই ধরনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মোতাহার হুসেন বলেন—

> অনেকে বলে থাকেন,—স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা কখনো অস্বীকার্য নয়, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা-পদ্ধতি পুরুষের শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া উচিত, মেয়েদের বি-এ, এম-এ পড়ায় লাভ কি? তারা কি হাকিম আমলা হবে?—একথার অর্থ হয়তো এই; সাহিত্য, লজিক, ফিলজফি প্রভৃতি বিষয় পড়বার মেয়েদের দরকার নেই, তাদের দরকার শুধু সূচীকর্ম, পাক-প্রণালী, প্রসূতি শুশ্রূষা প্রভৃতি গৃহস্থালীর জন্য নিত্য আবশ্যকীয় কেজো-জ্ঞান লাভ করা, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর নিকট চিঠিপত্র লিখবার মত লেখাপড়া জানা। কিন্তু উত্তরে তাঁদের বলি, শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে তাঁরা অনেকটা দূরে সরে পড়েছেন। শিক্ষার যে আদর্শ-মানুষের অন্তরের সামর্থ্যকে জাগ্রত করা, তা ভুলে গিয়ে মেয়েদের স্বামীর জন্য উপযুক্ত করাই যেন তাঁরা শিক্ষার উদ্দেশ্য মনে করেছেন। এই উদ্দেশ্য নেহাতই মন্দ, নিতান্তই ঘৃণ্য! মেয়েদের শিক্ষা মেয়েদের মানসিক উন্নতির জন্যই, বরের অভিরুচির জন্য নয় বরের বাজার সস্তা করবার জন্য যে শিক্ষা, তা মেয়েদের পক্ষে নিতান্তই অপমানজনক। সুতরাং সর্বদা বর্জনীয়।
>
> মানসিক উৎকর্ষের শিক্ষা পেতে হলে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই সাহিত্য, লজিক, ফিলজফি প্রভৃতির দ্বারস্থ হতে হবে। এসব শিক্ষা স্ত্রী-পুরুষ সকলের Common-সাধারণ। অবশ্য এ সকল নিছক জ্ঞানলাভেই শিক্ষার শেষ নয়। আমাদের সাংসারিক জীবন যাপনের জন্য সকলেরই কিছু Technical education লাভ করা দরকার।....এই Technical education-এর ক্ষেত্রেই থাকবে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার প্রভেদ, অন্যত্র নয়। আর সে প্রভেদ বিরূপিত হবে, স্ত্রী-পুরুষের শরীর ও মনের গঠন-বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই। অপেক্ষাকৃত সরলদেহ ও রুক্ষপ্রাণ পুরুষের যেমন শোভা পায় না সূচীকর্ম, তেমনি অবলা কোমল-প্রাণা স্ত্রী জাতির জন্য মানানসই হয় না মিস্ত্রীর কাজ। General education-এর বেলায় কোন প্রভেদ না করে Technical education-এর বেলায় প্রভেদ করলেই যেন স্ত্রী-পুরুষ সকলের শিক্ষাই সার্থক হয়ে ওঠে।[৫৪]

বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার দৈন্যের মূল কারণ হিসেবে আবুল হুসেন বলেছেন যে, শুধু শিক্ষার্থী নয়—উপযুক্ত শিক্ষা শিক্ষকের ওপরও নির্ভর করে—

> বাইরের বক্তাদের বকুনি বা চিৎকার কখনই কোন জাতির মুক্তি আনতে পারে না—যদি শিক্ষাকেন্দ্র হতে ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ তৈরী না হয়...এখন শক্ত প্রশ্ন এই দেশের মানুষকে কেমন করে মুক্তি দেওয়া যায়? এ প্রশ্নের উত্তরটি সোজা কথায় এই যে, স্কুল-কলেজগুলিকে প্রকৃত শিক্ষা-কেন্দ্র করে তোলা ও শিক্ষকগণকে প্রকৃত মুক্তির পুরোহিত করে তোলা। শিক্ষক তাঁর বিপুল প্রাণ, তাঁর অগাধ প্রেম, গভীর সহানুভূতি ও অপরিমেয় জ্ঞানের সবটুকু দিয়েই শিক্ষার্থীকে মানুষ করবেন—তার ব্যক্তিত্বকে পুষ্ট করে তুলবেন—তবে সে শিক্ষার্থী বেরিয়ে এসে জীবনের কর্মক্ষেত্রে নিত্যনতুন সম্পদের উৎস সৃষ্টি করে জাতির ঐশ্বর্য ও শক্তি প্রতিদিন বৃদ্ধি করতে থাকবেন। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ ও গৌরবস্থল হচ্ছেন শিক্ষকগণ। মুক্তির পতাকা তাদেরই হাতে।[৫৫]

শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন—

> সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য যেমন নাবিক, সমাজ বা দেশের পক্ষেও তেমনি শিক্ষক। আরোহীরা কত বিচিত্র খেয়াল ও খুশীর ভিতর দিয়ে দিন কাটাতে থাকেন, নাবিকেরা সে-সব দেখেন, সময় সময় তাঁদের বুকও আন্দোলিত হয়, তবু জাহাজ চালনা তাঁদের বড় লক্ষ এ-ব্যাপারে ভুল হওয়া মারাত্মক। সমাজ বা দেশের বিচিত্র জীবনযাত্রাও

www.pathagar.com

> তেমনি শিক্ষকের বুকে স্পন্দন জাগাতে পারে, কিন্তু সর্বাগ্রে তিনি শিক্ষক—মানুষের মনের লালন, শৃঙ্খলা-বিধান তাঁর বড় কাজ, এবং সেইজন্য তিনি স্বদেশ-প্রেমিক বা বিশেষ ধর্ম-প্রেমিক ইত্যাদি যাই হোন তারও উপরে তিনি বৈজ্ঞানিক, Man of science বিচার-বুদ্ধি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—একথা বিস্মৃত হলে মানুষের সেবাও আর তাঁর দ্বারা হয় না।[৫৬]

জীবসত্তার লালন-পালনই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়—শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মন ও আত্মার বিকাশ এবং মানবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ ঘটানো। এ জন্যই মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন—

> মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নীচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্ব-লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্যকথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে, তার অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখার কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস-আস্বাদন করা যায়।[৫৭]

মুসলিম সাময়িকপত্রে প্রকাশিত শিক্ষা বিষয়ে কিছু কিছু বক্তব্য পরবর্তী অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো—

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. A.F. Salauddin Ahmed, Social Ideas and social change in Bengal, 1818-1835, P-140, Shaker spenk & Co. Calcutta 1917.
২. A. Howell, Education in India. P. 75, Macrilland Co. 1951.
৩. Sayed Nurrallha & J.P. Naik, A Studies History of Education in India (1800-1947), P. 54 Mac Millan & Coltd. Calcutta. 1951.
৪. ঐ
৫. R.G. Wilder, Mission Schools in India, P. 36-37.
৬. J.A. Richter, A History of Mission in India, P. 149, as quted in Nurulla & Naik.
৭. Nurullamh & Nalk. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৮. ঐ, পৃ. ৩৭
৯. ঐ, পৃ. ৪৩
১০. Sayed Mahmood. History of English Education in India, P. 11. পূর্বোক্ত
১১. ঐ, পৃ. ৪১
১২. ঐ, পৃ. ৪২
১৩. ঐ, পৃ. ৪৪
১৪. ঐ, পৃ. ৪৫
১৫. ঐ, পৃ. ৪৬
১৬. Nurulla & Nalk, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১৭. ঐ, পৃ. ৪৮
১৮. ঐ, পৃ. ৪৫
১৯. ঐ, পৃ. ৪৭
২০. J.A. Richter, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
২১. W.H. Sharp, পৃ. ৪৭, পূর্বোক্ত
২২. M.A. Sherring. The History of Protestent Missions in India. P. 75
২৩. সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২৭, চিরায়ত, কলিকাতা, ১৯৭৩
২৪. গভর্ণর স্যার জনশের Notes on India Affair P. 39
২৫. H.A. Stark, Varnacular Education in Bengal, Calcutta, 1916. P. 45
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
২৮. Charls, E. Travelyan on The Education of the People of India. London, 1838
২৯. লালবিহারী দে, Recollection of Alexander Duff পৃ. ৩৭ Calcutta. 1955.
৩০. নগেন্দ্রনাথ সোম, রাজা রামমোহন রায়ের জীবন, পৃ. ৩৪০ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৩৮১
৩১. সুধাকর, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩
৩২. H.A. Stark, Varnacular Education in Bangal, Calcutta, 1915, P. 17.
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
৩৪. Chales E. Travelyan on The Education of the People of India, P. 90.

www.pathagar.com

৩৫. মেকলের মিনিট, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫
৩৬. Sir Courtgny Libert. Coronation Darbar and its Conseqesence, P. 493-99
৩৭. রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি, খোন্দকার সিরাজুল হকের মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম হতে উদ্ধৃত, পৃ. ৫০, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪
৩৮. ঐ, পৃ. ৫১
৩৯. Proceddings of the Pakistan Educational Conference Held at Karachi from 27th November to its December, 1947 (Karachi, Education Division, Government of Pakistan, P. 8)
৪০. পূর্বোক্ত, Proceedings of the Pakistan Educational Conference Held at Karachi from 27th November to its December, 1947, (Karachi Education Division Govt of Pakistan, p. 9)
৪১. ঐ, পৃ. ১০
৪২. ঐ, পৃ. ৬৬
৪৩. Proceedings of the Ist Meeting of the Advisory Board of Education for Pakistan, 7th to 9th June, 1948, Karachi, 1948. Appendix III.
৪৪. Quaid-E-Azam Muhammad Ali Jinnahs Speeches as Governer General of Pakistan, Pakistan Publication, Karachi, P. 89.
৪৫. ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে শিক্ষা কনফারেন্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায়।
৪৬. K.P. Misra, M.K. Lakhi and Virendra Narain, Pakistans Search for Constitutional Consensus (New Delhi, Impex India, 1967, P. 9.)
৪৭. বদরউদ্দীন ওমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, (৩য় খণ্ড) পৃ. ৭৪. পূর্বোক্ত
৪৮. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1956, Article No 214.
৪৯. মৌলানা আকরাম খাঁন সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ কোন সংবাদপত্রেই ছাপা হয়নি।
৫০. বদরউদ্দীন ওমর, ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে কতিপয় দলিল, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৫৫
৫১. Preamble of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1956, Article 25, Clauses A.B.C.
৫২. Report of The Educational Reforms Commission 1957....Govt. of East Pakistan. P-2.
৫৩. Partx. Islamic Institutions. Chapter-I
৫৪. From President Ayubs Speeches on the New Constitution 1962. Quoted in G.W. Chowdhry's Documents and Spechies on the Constitution of Pakistan, p-795.
৫৫. Question-Answar Meeting Between the President Field Marshall Muhammad Ayub Khan and the Editors of Pakistan Newspapers held on March-1. 1962, at Karachi, Documents and Speeches on the Constitution of Pakistan. P-797.
৫৬. Report of the Commission of Student Problem and Welfare, Karahi, Govt. of Pakistan, 1966, P. 192-193.
৫৭. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪, পরিশিষ্ট-১
৫৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান, ১৯৭২, পৃ. ১২

www.pathagar.com

৫৯. ঐ, পৃ. ১-২
৬০. Sir Goorodas Centenary, Vol, Calcutta University, P. 13-14.
৬১. ভূজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র শিক্ষা দর্শন, পৃ. ৬২. চিরায়ত, কলিকাতা, ১৯৭৪
৬২. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৮৮, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭১
৬৩. ২১শে জানুয়ারি, ১৭৮৫ খ্রিঃ হেস্টিংস-এর মিনিট
৬৪. ড: কাজী আবদুল মান্নান : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, পৃ. ৪৭. পূর্বোক্ত
৬৫. ঐ, পৃ. ৪৮
৬৬. ঐ, পৃ. ৪৭
৬৭. ঐ, পৃ. ৪৯
৬৮. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, পৃ. ৩৫, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩
৬৯. ঐ
৭০. ঐ
৭১. বাংলার মুসলমানের কথা—কাজী আবদুল ওদুদ, আজকের কথা, পৃ. ২২, কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
৭২. খোন্দকার সিরাজুল হক—মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, পৃ. ১৭, পূর্বোক্ত
৭৩. যোগেশচন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ. ৩৫
৭৪. Abdul Luteef, A Short Account of my Humble Efforts etc. P. 5-6 1889 (Calcutta, 1889), পুস্তিকায় বলা হয় :
৭৫. Abdul Luteef, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪
৭৬. Abdul Karim B.A., Mohammedan education in Bengal, Calcutta, 1990. P-1
৭৭. Nowab Bahadur Abdul Latif : His writings and related documents. P-23
৭৮. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ : মুসলমানের শিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা, মোয়াজ্জিন, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩১
৭৯. আবুল হুসেন : বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যত, জাগরণ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫
৮০. কাজী আনোয়ারুল কাদির ; বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ, শিখা, ১ম বর্ষ, ১৩১৩
৮১. কাজী আবদুল ওদুদ : পথ ও পাথেয়, সমাজ ও সাহিত্য, পৃ. ৪২
৮২. আবুল হুসেন : যুক্তির কথা, সওগাত, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬
৮৩. মোতাহের হোসেন চৌধুরী : বাঙালী মুসলমানের দৈন্য, সওগাত, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৭
৮৪. আবুল হুসেন : বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা, শিখা, ১ম বর্ষ, ১৩৩৩
৮৫. কাজী মোতাহার হোসেন : বাঙালীর সামাজিক জীবন, সঞ্চরণ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১১৪
৮৬. আবুল হুসেন : তরুণের সাধনা, সওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৬
৮৭. কাজী আবদুল ওদুদ : সমাজ ও সাহিত্য, পৃ. ৬৯
৮৮. মোতাহের হোসেন চৌধুরী : মনুষ্যত্ব, সংস্কৃতি কথা, পৃ. ১২৮।

www.pathagar.com

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীরোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে এবং কত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হাউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা-বিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নীচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন, তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলায় অট্টহাস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুগুলার বিদ্যা একটা অদ্ভুত জিনিস, তার খোসার কাছে তলতল করে, তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবু-সম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিদ্যাটাকে যে প্রণালীতে জাগ দেওয়া হয় সেই প্রণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে-বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্যালোকের তা লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল পূর্বদেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাঁচ কষা এবং ব্যাকরণসূত্রের জাল বোনা চলিত সেও তো অত্যন্ত কুনোরকমের বিদ্যা। এ কথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পণ্ড এবং কুনো; পশ্চিমেও পেডান্ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তবু এ কথা মানিতে হইবে তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বদ্ধ ছিল বটে কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়িতে নাড়িতে সজীব ও সবল হইয়া বহি। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষি, কি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেচ পাইত। সুতরাং এ জিনিসের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্ ইহা নিজের মধ্যে সুসংগত ছিল।

কিন্তু আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে; সে কি চিন্তায়, কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয় এ কথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশ শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উলটো দিকে গজাইবে।

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্যদিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম সেদিন বেহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা, ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারি নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার একথা মানি কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যারা তাঁদের অধিকাংশই খোড়ো ঘরে মানুষ, এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে এ কথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল-হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদেরা হাতে-খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকযন্ত্রের 'পরে নয়, দেবতার 'পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া আছে—শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মতো—অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলুনং কররুহৈঃ—অবশ্য ইনস্পেক্টরের কররুহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান, এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই

www.pathagar.com

কামনা ছিল। এইখানে ছোটোলাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয়তো অমিল আছে—এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়—উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল।

দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান-বাজন, আহার-বিহার, আমোদ-আহলাদ, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজ্যশাসন, আইন-আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে; এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক—এই বিপুল ভার বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না, এইজন্য বর্তমান সভ্যতাকে যে-দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো, তার হাত-পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে; সে জানেও না এত বেশি হাঁস-ফাঁস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে, দৈত্যটার দৃঢ়বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানি পাখা, চীনাবাসন, হরিণের শিং, বাঘের চামড়া—তার এ কোণ ও কোণ হইতে বিচিত্র নিরর্থকতা দুঃস্বপ্নের মতো ছুটিয়া যাইবে; মেয়েদের মাথার টুপিগুলা হইতে মরা পাখি, পাখির পালক ও নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অদ্ভুত জঞ্জাল খসিয়া পড়িবে; তাদের সাজসজ্জার অমিতাচার বর্বরতার পুরাতত্ত্বে স্থান পাইবে, যে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুষি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে; শিক্ষা বল, কর্ম বল, ভোগ বল, সহজ হইয়া ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে; এবং মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

সে কবে হইবে ঠিক জানি না। ততদিন ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে উপদেশ শুনিতে হইবে যে, প্রভূত আসবাবের মধ্যে বড়ো বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ মাটির তলাটাই মানুষের প্রাইমারি, ওইটেই প্রাথমিক; ইঁটের কোটা যত বড়ো হাঁ করিয়া হাই তুলিবে বিদ্যা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধুরা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কলেজ জুড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তরুতলকে অশ্রদ্ধা করে নাই আজ তাকে তৃণাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে চায়। যতই বলি না কেন, শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্চেই রাখিব, কায়দাটাকে আমাদের মতো করিতে দাও—সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কিনা, ওই কায়দাটাই তো শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জন্যই ওই কায়দাটাকে যথাসাধ্য করিয়া তুলিব। কাজেই আমাকে বলিতে হইল, অন্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অন্তঃকরণের অনুচর সে অংশে তাকে অমান্য করা দীনতা এ কথা জানি। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যটাকে য়ুরোপ এখনো বাহির করিতে পারে নাই; বাহির কবিরার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদিগকেও সেই চেষ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে? প্রয়োজনকে খর্ব না করিয়াও সমস্তটাকেও সাদাসিধা করিয়া তুলিব সে আমাদের নিজের স্বভাব ও

www.pathagar.com

নিজের গরজ অনুসারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি কিন্তু মেজাজটাকে সুদ্ধ লইতে হইবে সে যে বিষয় জুলুম।

পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, স্টেটের সাহায্যে কত বড়ো বড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সুলভ শিক্ষার উপায় অনেক আছে। কেবল গরিব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্মূল্য হইল? অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচা কেনা হইত না।

দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ ইহা তো অন্যত্র দেখিয়াছি। এইজন্য য়ুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরিব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল—এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জনও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে এই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলে ও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি,আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের,আর সংখ্যা যতি কমে তো বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সে জন্য শিক্ষাবিভাগে উদ্‌বেগ নাই। এই উপলক্ষে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে, এই তো দেখি লেখাপড়ায় বাঙালির শখ আপনিই কমিয়াছে—— যদি গোখলের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে তো অনিচ্ছুকের পরে জুলুম করাই হইত। এ-সব কথা নির্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইয়লণ্ডে যদি দেখা যাইত লোকইর মনে শিক্ষার শখ আপনিই কমিয়া আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই-সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির 'পরে যে দরদ—— বাঙালির'পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবি মিটাইয়াও মানুষ-প্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্মবুদ্ধির বর্তমান অবস্থায় স্বজাতির জন্য প্রতাপ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনেক দুর্লভ জিনিস অন্যকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে কিন্তু এখনো এমন-কিছু আজে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানেকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্য ডাক্তার খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেষ্টি সৎকারেরই আয়োজনটা পাকা করা উচিত।

তবে কিনা, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত, অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবি করিলে সে এক রকম ঠকানো হয়। ইহাতে বড়ো কেহ ঠকেও না। কেবল চিনা-বাজারের দোকানদারের মতো করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি; যে জিনিসের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড়ো দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না

www.pathagar.com

পায় সেদিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে, নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই বেশি করিবে, তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন-কি, অনিষ্টকর। জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘ্যাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত যাচাই করিতে হইলে দুটো একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল কনফারেন্স নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালির চোখ ফুটাইয়া দেওয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই নিতান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এইজন্যই দেশের পুরা দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে, দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না— তার কারণ এই যে, আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপ-হাস্যতাম্।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকারপ্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে, ইস্কুল-কালেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোক-শিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষা-বিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজন এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বই-কি, সেই জন্যেই কঠোর সংকল্প চাই। একবার

www.pathagar.com

ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স্, তার উপরে, দেশে যে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্—সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি জর্মান শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাসনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্‌মুখে বলা যায়।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্যেমশায় ওরই মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এতবড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না—একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা চুলোয় যাক, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি তো পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উসখুস করিয়া ওঠে তা হলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন-কি, লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও বুঝি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন-পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্যে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আম্‌দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহূত যারা তারা ভিতর বাড়িতেই বসুক—আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক-না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না হয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়াধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা এক সঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

www.pathagar.com

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর-একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনোমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয়না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন-কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলণ্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মূলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিখার কিরয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

যাই হোক ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না।

কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই না হয় দু-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমের সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না? স্টীমার না হয় তো পানসি?

ভালোমতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তি কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ওই রাস্তাটাতেই। তাই হোক—বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলেধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

অনেকদিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাসদোষে বেফাঁস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার তো মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কৌশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়াছিলাম গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম

www.pathagar.com

খাইতে দিলেও সে চেঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে শুরু করিয়াছিলাম আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারই এককোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতোই কথা হইয়াছিল; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার সুর আপনি চড়িতে থাকে; আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও সেটা নূতন নয়। শুনিয়াছি আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুসংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা এক-শো পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুড় ঘরেই মরে। আর সাংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিসটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে-বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াছেনও। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দুপাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলা শিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হুঁচট খাইতে খাইতে চলে, তখন চার-ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে, ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। এই তো সব আছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরো অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননামা বাঙালি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাতসমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে কেবল বাংলা দেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদের নাই!

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা

www.pathagar.com

ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজাউজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভরতি করে, দেহপূর্তি করে না।

সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁদে তৈরি। ওই বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়ো-গোছের সীলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই য, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই-করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারো পূঁজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীল বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রী লইতেই হয়—কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয় যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমত বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা-সাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল; তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল; কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলাসাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না—আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতিবাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া

www.pathagar.com

আমাদের সাহিত্যকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে, এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়! দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কালেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ওই ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে—এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্‌গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয়দান করিবে।

কিন্তু ওই কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক্-না। আমাদের দেশে যেখানে ফল চাহিতেছে ছায়া চাহিতেছে সেখানে কোঠা বাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি না কেন? গুরুর চারি দিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা—ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্-না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—'আমরা চাই!' এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

---

www.pathagar.com

ড. সফিউদ্দিন আহমদ বাংলা প্রবন্ধ ও গবেষণা সাহিত্যে একটি বিশেষ পরিচিতি নাম। তাঁর জন্ম (১৯৪৩) নরসিংদি জেলার রায়পুরা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও এম.এ-র কৃতিছাত্র। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তুলনামুলক সাহিত্যে এবং বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশুনা করেন ও পিএইচ-ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি প্রচুর কবিতা ও গল্প লিখেছেন। ষাটের দশকে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত তাঁর গল্প 'মানুষগড়ার কারিগর', 'ডাকপিয়ন', ' মেরুদণ্ড', 'উত্তরণ', 'সিড়ি' ও ঈদ মানে আনন্দ'' আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। 'ডাকপিয়ন, গল্পটি রুশভাষায় এবং 'মানুষগড়ার কারিগর' ও 'উত্তরণ' ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। নতুন সাহিত্য আন্দোলন 'সাক্ষর' ও 'বক্তব্য' গোষ্ঠির পুরোধায়ও তিনি ছিলেন। একজন প্রগতিশীল ও মৌলিক গবেষক হিসেবে তিনি দেশে ও বাহিরে বিশেষভাবে পরিচিত। অতিথি অধ্যাপক হিসেবে তিনি কোলকাতা, যাদবপুর, কল্যাণী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিরেজিও, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে তিনি নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, আসাম রাজ্যের শিলচরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সম্মেলনে এবং সুরমা বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সহস্রাব্দ মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। বাংলা একাডেমি হতে প্রকাশিত তাঁর দশটি গবেষণা গ্রন্থসহ বিশটি গবেষণাগ্রন্থ বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স বই হিসেবে পাঠ্যতালিকাভুক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা একডেমি গবেষণা পত্রিকা ও বিশ্বভারতী পত্রিকাসহ বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর একশোর উপর গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মূলত তিনি একজন তথ্যনিষ্ঠ, সত্য সন্ধানী মৌলিক গবেষক। জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ড. শফিউদ্দিন আহমদ বর্তমানে শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও প্রধান।

www.pathagar.com